মহারাজ নন্দকুমার

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,
বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

লেখকের অন্যান্য বই

টলষ্টয়ের গল্প	...	...	১৷৹
বোকার কাণ্ড	...	...	৷৵৹
মাটির নেশা	...	...	৷৹
ঋষি টলষ্টয়	...	...	৷৷৹
চাণক্য	...	...	৷৵৹
ভুলের ফল	...	...	৷৵৹
এ-যুগের দাসত্ব	...	...	৷৷৹

আশ্বিন, ১৩৩৭

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
দাম
মেট্‌কাফ প্রেস,
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহারাজ নন্দকুমার

কোম্পানীর বাণিজ্য

পলাশীর আম্রকুঞ্জে ক্লাইবের বিজয় পতাকা উড়িয়াছে। সিরাজের কাঁচা রক্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত মস্‌নদে বসিয়া বিশ্বাসঘাতকচূড়ামণি মীর জাফর উৎকট উল্লাসে আত্মহারা।

যাহাদের মন জোগাইয়া, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া, তিনি শুধু নিজের ঘৃণিত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, তিনি যে তাহাদের খেলার পুতুল হইয়া থাকিবেন ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। তিনি তখন নামেই বাংলার নবাব, আর বাংলার প্রকৃত নবাব বিলাতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

কোম্পানী বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্য চালাইতে ছিল। মীর জাফরের সঙ্গে কোম্পানীর প্রথমেই এই ... হইয়াছিল যে, বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি একেবারেই ... ক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কোম্পানী যাহা ... করিবে। মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি ... কোম্পানীর খুব বড় বড় কুঠি, খুব বড় বড় ... তাহার বাণিজ্য তখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া ... অধীনে তখন বহু দেশীয় গোমস্তা কাজ ... সব গোমস্তা কোম্পানীর অর্থলিপ্সু কর্ম্মচারীদের মনস্তুষ্ট করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিবার লালসায় নিরীহ শিল্পী, সরল-প্রাণ তন্তুবায় এবং শান্তিপ্রিয় পল্লীবাসীর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার, অনাচার করিতে লাগিল। এমন কি দেশের বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদারগণ পর্য্যন্ত এই সব গোমস্তার ভয়ে তটস্থ হইয়া উঠিলেন। নবাব ইহার কোনও প্রতিকার ত করিতে পারিতেনই না, পরন্তু ভয়ে অস্থির থাকিতেন, কারণ এই গোমস্তাদের পশ্চাতে ছিল কোম্পানীর বিপুল শক্তি। লর্ড ক্লাইবের দ্বি-শাসনে (Double Government) সারা দেশে একটা অনাচারের রাজত্বই চলিয়াছিল।*

* Bolts—Consideration on India Affairs.

ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে নবাব এতই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যাহা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া তাঁহারও মনে হইত এবং যাহার প্রতিবাদ করিলে সর্ত্ত বা চুক্তি ভঙ্গ হওয়ারও কোন কারণ ছিল না, তাহাতেও তিনি মৌন হইয়াই থাকিতেন। তিনি ইহা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, যাহারা তাঁহাকে সিংহাসন দিতে পারিয়াছে তাহারা যখন ইচ্ছা তখনই সেই সিংহাসন কাড়িয়াও লইতে পারে।

পেয়াদা, হরকরা প্রভৃতি লইয়া গিয়া এক একজন গোমস্তা এক এক জায়গায় কাছারী বসাইত। তার পর হরকরা পাঠাইয়া নিকটস্থ পল্লীগ্রামের তন্তুবায়দের একে একে ডাকিয়া আনাইত। দেশের প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণই যাহাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিতেন না তাহার হুকুম অমান্য করিবার মত সাহস যে একজন সামান্য সরল তন্তুবায়ের হইতে পারিত না ইহা বলাই বাহুল্য। গোমস্তার কাছারীতে তাহাকে আসিতেই হইত। তার পর তাহার সমস্ত কাপড় কিনিবার জন্য গোমস্তা তাহাকে অগ্রিম টাকা দিত এবং এই মর্ম্মে একটি দলিলে নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইত যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র গোমস্তাকে বুঝাইয়া দিতে

হইবে, তাহা সম্ভবই হোক্ আর একেবারেই অসম্ভব হো‍ এবং তাহার দাম যত কমই দেওয়া হোক্। তাঁতীর ইচ্ছা থাক্ বা নাই থাক্ গোমস্তার ইচ্ছা মতই তাহাকে চলিতে হইবে। যদি কোন তাঁতী এই অগ্রিম টাকা নিতে অস্বীকার করিত, গোমস্তার ইচ্ছানুযায়ী চুক্তিতে [illegible] না দৈ তবে তাহার আর নিষ্কৃতি ছিল না। টাকা ত তাহা নিতে হইতই, তাহা ছাড়া তাহাকে বেত্রাঘাতে সমুচি শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্তও তৎক্ষণাৎ করা হইত। *

তাঁতীরা যাহাতে স্থানীয় বাজারে, কিংবা ফরাসী ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কাপড় বিক্রয় করিতে না পা সেজন্য তাহাদের উপর খুব কড়া নজর রাখা হইত যাহাদের উপর এই সতর্ক দৃষ্টির ভার থাকিত তাহাে শৈথিল্য দোষে যদি তাঁতীরা অন্য কোনও স্থানে কাপ বিক্রয়ের সুবিধা পাইত, তাহা হইলে তাঁতীদের ম তাহাদেরও কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। বাজা যে-দামে কাপড় বিক্রয় হইত, কিংবা অন্যান্য বিদে সদাগর যে-দাম দিতে চাহিত, বিলাতী কোম্পানীর গোম কখনো কখনো কাপড়ের দাম তাহা হইতে শতকরা ত্রি

---

* Bolts

চল্লিশ টাকাও কম দিত। ইহা সত্বেও কোম্পানীর গোমস্তা ভিন্ন আর কাহারও নিকট কাপড় বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না। তবুও যদি বিক্রয় করে, এই ভয়ে গোমস্তা তাঁতে যতটুকু কাপড় বোনা থাকিত তাঁত হইতে ততটুকুই কাটিয়া লইয়া যাইত। শুধু ইহাই নয়, দাদন দেওয়ার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে এত বেশী বস্ত্র প্রস্তুত করিবার ফরমাস্ দেওয়া হইত যে, তাহার দশগুণ বেশী সময়ের মধ্যেও ততটা প্রস্তুত করা অসম্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাণিজ্যে কোনও রকমের সুযোগ না দেওয়া এবং নিজেদের একাধিপত্য রক্ষা করাই হইল ইহার কারণ। যদি যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র তাঁতী দিতে না পারিত তাহা হইলেই ক্ষতিপূরণের অজুহাতে তাহার ঘর-বাড়ী লুট করিয়া নেওয়া হইত। বহু অবস্থাপন্ন তন্তুবায় একেবারে অর্থহীন, গৃহহীন ও সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইয়া পড়িত এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া পথে বসিত। ঘর-বাড়ী লুট করিয়া, গৃহস্বামীকে চাবুক মারিয়া, চোর-ডাকাতের মত হাতকড়ি দিয়া লইয়া গিয়া জেলে দিয়াও বাঙ্গালী গোমস্তার পৈশাচিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই; লুণ্ঠিত গৃহের নিতান্ত অসহায়া স্ত্রীলোকদের উপরেও মাঝে মাঝে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলিত, তাহাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন সতীত্ব

পর্য্যন্ত হরণ করা হইত। ইহার উপর আবার সমাজে নিদারুণ অত্যাচার ত ছিলই। ফলে এই বিপদের উপ তাহাদের আরও বিপদ ঘটিত, তাহাদের সমাজচ্যু জাতিচ্যুত হইতে হইত। কোম্পানীর বাণিজ্যে একাধিপ বজায় রাখিবার জন্য এমন কোন হীন কর্ম্মই ছিল যাহা এই দেশীয় গোমস্তারা করে নাই। কাশিমবাজারে রেশমের কুঠির কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে ১৭৬৬ খৃষ্টা ইহার নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে একরাত্রে সাত শ তন্তুবায় তাহাদের চিরআদরের, চিরসুখের, চিরকাে বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আজও প্রবাদ রহিয়াছে। *

অর্থলোভী কোম্পানী বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপনে জন্য এই কুৎসিৎ উপায় অবলম্বন করাতেই আজ বাংল দেশের বস্ত্রশিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। যাহার ব শুধু এ-দেশের নয় সুদূর ইউরোপের রাজ-রাজড়াও ভু বলিয়া মাথায় ধারণ করিয়াছিলেন আজ তাহাকেই নিজে লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য পরের মুখের দিকে চাহ থাকিতে হয়।

কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল টাকা। বাণিজ্যে

* Bolts

একচেটে অধিকারের বলে সে-অভিষ্ট সিদ্ধির পথ সুগম হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী দলে দলে কোম্পানীর কাজে যোগ দিতে লাগিল, আর নানা রকমে কোম্পানীর মন জোগাইয়া নিজেরা ধনী হইয়া উঠিল।

বাংলাদেশের নানা স্থানে কোম্পানীর লবণের গোলা স্থাপিত হইয়াছিল। লবণের বাণিজ্যেও কোম্পানী একাধিপত্য স্থাপন করিল। দেশীয় লোকের প্রস্তুত লবণ সমস্তই কোম্পানী কিনিয়া লইত, অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না। মজা এই যে, কোম্পানীর কাছে মাত্র বারো আনা দামে মণ বিক্রয় করিয়া, দেশীয় লোকদের আবার কোম্পানীর নিকট হইতেই পাঁচ টাকা দরে লবণের মণ কিনিতে হইত।

লবণের বাণিজ্যে কোম্পানীর এই একাধিপত্যের কথা জানিতে পারিয়া কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টরগণ ইহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বারে বারে আদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। একে একে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, ডিরেক্টরগণও বারে বারে লিখিতে লাগিলেন। দুই বৎসরেও তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া তাঁহারা লবণের মণ দুই টাকা করিয়া

বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। তার পর হইতে বারো আনা দামের লবণ পাঁচ টাকা হইতে দুই টাকায় নামিয়া আসিল।

এমন কি তামাক ও সুপারীর ব্যবসা পর্য্যন্ত কোম্পানী আরম্ভ করিল। তখন ক্লাইব ও তাঁহার কাউন্সিলের মেম্বরগণ কলিকাতায় একটি বণিক-সভা স্থাপন করিলেন। কোম্পানীর অধিকাংশ ইংরাজ কর্ম্মচারীই এই সভার সভ্য হইলেন। এইরূপ নিয়ম করা হইল যে, যত লবণ, তামাক ও সুপারী দেশে উৎপন্ন হয়, দেশীয় লোককে তাহার সমস্তই এই বণিক-সভার নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে।

সে-সময়ে যে-সব ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই নিতান্ত চরিত্রহীন ছিলেন। ভাল ইংরাজ খুব বেশী আসিতে চাহিতেন না, কারণ অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষের জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ। এখানে আসিলে প্লীহা-যকৃতের আক্রমণ ও তাহাতে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। কাজেই যাঁহারা এখানে আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন 'বাপের খেদানো, মায়ের তাড়ানো' ছেলে। একেবারে শাসনহীন, নৈতিক চরিত্রহীন অনেক যুবক বাণিজ্যের নামে লুট ত করিতই, পরন্তু অসহায়া বঙ্গ-

ললনার উপরে পর্য্যন্ত তাহাদের কামলোলুপ দৃষ্টি পড়িত। তখন খুব অল্পসংখ্যক ইংরাজ রমণী ভারতবর্ষে আসিতেন, সুতরাং এই উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী যুবকের দল বিবাহ করিতে না পারিয়া দেশীয় গোমস্তা প্রভৃতির সহযোগিতায় ছলে বলে কৌশলে অনেক বঙ্গরমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিত।

এইরূপ নানা রকমের অত্যাচারে, অনাচারে তখন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস জুড়িয়া একটা বিরাট হাহাকার স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। *

সুচতুর ক্লাইব যখন ইংরাজ কোম্পানীর জন্য মোগল সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা মঞ্জুর করাইয়া লইলেন তখন কোম্পানীর অর্থাগমের পথ আরও প্রশস্ত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নায়েব-দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। এদিকে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপনে গোপনে বেনামীতেও ব্যবসায় চালাইতে লাগিল।

* Burke—Impeachment of Warren Hastings & Macaulay—Warren Hastings.

কোম্পানী বিনাশুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করি
কিন্তু দেশীয় বণিকদের শুল্ক দিতে হইত। অনেক দে
বণিক কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের যথোপযুক্ত উৎকে
দিয়া বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার সুযোগ গ্রহণ করি
অপর দিকে বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টর
টাকার জন্ম তাগাদা আরম্ভ করিলেন। এই অজুহ
টাকা আদায় করিবার জন্ম দেশের ধনী দরিদ্র সকা
উপরেই জোর-জুলুম চলিতে লাগিল। ক্ষেতে ফ
জন্মিল কিনা, দরিদ্রগণ দুই বেলা দুই মুঠা ভাত য
দিতে পারিল কিনা, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার ৫
নাই—কেবল রাজস্ব আদায় চাই—টাকা চাই।

২

মহারাজ নন্দকুমার

সমস্ত বাংলাদেশে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বাণিজ্যের নামে যে অর্থশোষণ আরম্ভ করিয়াছিল, দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও বড় বড় রাজপুরুষ যে জঘন্য অর্থ-লিপ্সার জন্য বাঙ্গালীকে নিষ্পিষ্ট করিতেছিলেন তাহার বিরুদ্ধে দেশের কোটি কোটি লোকের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অসাধারণ তেজস্বিতা ও বিচক্ষণ-তায় বাংলার গভর্ণর এবং পরে সমস্ত ভারতবর্ষের ইংরাজ অধিকৃত দেশ সমূহের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ও তাঁহার সহচরদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। ইনিই মহারাজ নন্দকুমার।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর এখন বীরভুম জেলার অন্তর্গত। নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায় অত্যন্ত পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বাংলার

মস্‌নদে, তখন পদ্মনাভ তিনটি পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় স্বয়ং আলিবর্দ্দীও অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

সেই সময়ের রীতি অনুসারে নন্দকুমার অধ্যাপকের কাছে থাকিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কি লেখাপড়ায়, কি অন্যান্য কাজে, সকল বিষয়েই তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। এখন যেমন ইংরাজী রাজভাষা, তখন তেমনি রাজভাষা ছিল ফার্‌সী; সুতরাং ফার্‌সী না শিখিলে কোন রাজকার্য্য পাওয়াও যাইত না, করাও যাইত না। তাই নন্দকুমার ফার্‌সীও শিক্ষা করিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালেই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে নন্দকুমার মহিষাদল পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার পাইলেন। খুব চতুর ও ক্ষমতাবান না হইলে, এত অল্পবয়সে অতবড় একটা পরগণার রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত না। তাঁহার কার্য্য-নৈপুণ্যের জন্য তিনি ক্রমশঃ হুগলীর দেওয়ান এবং পরে ফৌজদার (Magistrate) নিযুক্ত হন। শুধু বাংলার নবাবই যে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নয়; তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও

নবাব, কাজে তিনি কোম্পানীর হাতের পুতুলমাত্র। ক্রমশঃ তিনি ঘোর ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও পদচ্যুত করিয়া আবার সেই মীর জাফরকেই নবাব করা হইল।

মীর জাফর পূর্ব্ব হইতেই উৎকট কুষ্ঠ-ব্যাধিতে ভুগিতে-ছিলেন। নন্দকুমার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই মীর জাফরের বিশেষ অনুরোধে দিল্লীর বাদ্শাহ নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। অধিকন্তু মীর জাফর নিজেও তাঁহাকে 'মহারাজ' খেতাব দেন। একবৎসরের মধ্যেই মীর জাফরের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র নাজিম উদ্দৌলা নবাব হইলেন। এই সময়ে দেওয়ানী লইয়া এক সমস্যা উপস্থিত হয়। নন্দকুমার আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই দেওয়ান নিযুক্ত করা হইবে। নূতন নবাবও নন্দকুমারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তখন ক্লাইব ছিলেন তাঁহার ঘোর বিরোধী। ক্লাইব নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ রেজা খাঁকে দেওয়ান-সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নন্দকুমারের প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না।

৩

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের সহিত একজন পদ
মদগর্ব্বী, অর্থলিপ্সু, উৎকোচগ্রাহী ইংরাজের নাম নিত
অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁহার নাম ওয়ারেণ হেষ্টিংস্।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর একজন সামান্য কের
হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাংলাদেশে আসেন। ত
তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। তিনি যে অসাধা
বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহা তাঁহার কার্য্যাব
হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি
বীণাপাণির আশীর্ব্বাদ লাভে বিশেষ রকমেই বঞ্চিত হই
ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। তাহা না হইলে, যে-বয়
মানুষ বিদ্যালাভে নিয়োজিত থাকে সেই বয়সে ক
পিষিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তি
বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবেন কেন?

দুই বৎসর কলিকাতায় কেরাণীগিরি করিবার প
হেষ্টিংস্‌কে কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরীতে পাঠানো হ
কাশিমবাজার তখন একটি প্রকাণ্ড বাণিজ্য-কেন্দ্র ছি

তাহার মাত্র দুই মাইল দূরেই তখনকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। পাশাপাশি দুইটি নগর সর্ব্বদাই অসংখ্য দেশী ও বিদেশী মানুষের কল-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া থাকিত। কাশিমবাজারের লক্ষ্মীশ্রী বহুদিন হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদেরও সে-ঐশ্বর্য্য, সে-কীর্ত্তি, সে-গৌরব আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কাশিমবাজারে বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। কলিকাতার ইংরাজ-গণ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ওলন্দাজ বণিকদের অনুরোধে হেষ্টিংসের উপরে নবাব তেমন কড়া নজর রাখিলেন না। এই সুযোগ পাইয়া হেষ্টিংস্, নবাবের বিরুদ্ধে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহাতে যোগ দিলেন। এদিকে সিরাজদ্দৌলার উপরে প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ক্লাইব ও ওয়াটসন্ সৈন্যসহ মান্দ্রাজ হইতে বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে, ক্লাইবের মতই, হেষ্টিংস্ কলম ছাড়িয়া তলোয়ার ধরিলেন। তার পর পলাশীর যুদ্ধে কি করিয়া ইংরাজের জয় হইল, কি করিয়া ক্লাইবের সাধুতায় উমিচাঁদ

উন্মাদ হইলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী হইয়া আছে ইংরাজের দয়ায় মীর জাফর নবাবের গদী পাইয় তাহাদের একান্ত অনুগত হইয়া রহিলেন। এই নূত নবাবের রাজসভায় হেষ্টিংস্ কোম্পানীর প্রতিনিধি নিযু হইলেন।

তখন কলিকাতায় কোম্পানীর একটি কাউন্সিল ছিল ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই কাউন্সিলের সভ্য হইয়া হেষ্টিং কলিকাতায় আসিলেন। তখন ভান্সিটার্ট ছিলে কলিকাতার গভর্ণর। নবাবের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয় কোম্পানীর সাহেবেরা অল্পসময়ের মধ্যে খুব বেশী অ সঞ্চয় করিবার জন্য দেশময় বিষম ও বীভৎস স্বেচ্ছাচা আরম্ভ করিল। সেই অর্থপিশাচদের অমানুষিক অত্যাচা ও অনাচারে সরল, শান্ত বাঙ্গালীর বুক ফাটিয়া গভী আর্ত্তনাদ বাহির হইল। *

---

* "The master caste, as was natural, brok loose from all restraint; and then was see what we believe tobe the most frightful of a spectacles, the strength of civilisation withou its mercy"—Macaulay.

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ভারতবর্ষ হইতে তিনি যে প্রভূত অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। দেশে ফিরিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি অজস্র টাকা খরচ করিলেন; কাজেই সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গেল। কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না, কারণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেই পুনরায় টাকার অভাব দূর হইবে। ভারতবর্ষে কামধেনু আছে, দোহন করিলেই হইল,—কল্পতরু আছে, একবার ঝাঁকানি দিতে পারিলেই হইল। তিনি কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে আবার ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এই সাধু অভিলাষ তাঁহারা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পূর্ণ করিলেন। তিনি যে অত্যন্ত বিচক্ষণ, পারদর্শী ও উচ্চপদ লাভের যোগ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কোম্পানীর মান্দ্রাজ কাউন্সিলের সভ্য হইয়া তিনি আবার ভারত যাত্রা করিলেন।

এবার হেষ্টিংস্ মাহেন্দ্রক্ষণে দেশ হইতে পা বাড়াইয়াছিলেন। এবার তাঁহার বরাত খুলিয়া গেল। তিনি যে সত্য সত্যই ভাগ্যবান্ পুরুষ, তাহার পরিচয় তিনি ভারতে আসিবার পথেই দিয়াছিলেন।

যে-জাহাজে চড়িয়া হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষে আসিতে-

ছিলেন সেই জাহাজে ইমৃহফ্ নামে একজন জার্মা
ভদ্রলোক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। ইমৃহফ
ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর। দেশে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম
ছিল, কিন্তু অর্থাভাব হওয়ায় তিনি ভারত যাত্রা করেন
এখানে আসিলে অর্থাভাব দূর হয় একথা তিনিও শুনিয়া
ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী খুব রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন
তখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতে তিন-চারি মা
সময় লাগিত। জাহাজে কয়েকদিনের মধ্যেই হেষ্টিংসে
সঙ্গে ইমৃহফ্ ও তাঁহার স্ত্রীর বন্ধুত্ব জন্মিল।

রমণীর কোমল হৃদয় জয় করিতে—বিশেষ করিয়া বন্ধু
পত্নীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে—অন্ততঃ তখনকার দিনে
হেষ্টিংস্ অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমত
সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইবও 'সার্টিফিকেট্' দিয়া গিয়াছেন।* ক্রমশ
হেষ্টিংসের কথাবার্ত্তা, চালচলন ও হাবভাবে শ্রীমতী ইমৃহ
মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইমৃহফ্ দুরবস্থ
পড়িয়াছিলেন, কাজেই দরিদ্র স্বামীর অনুরাগিণী থাকিতে
শ্রীমতীর বোধ হয় আর ভাল লাগিতেছিল না। হেষ্টিংসে

* "...he (Clive) had never heard of Hastin
having any qualities except for seducing h
friends' wives."—Beveridge.

প্রথমা পত্নী কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনিও তখন সম্পূর্ণ বন্ধন-মুক্তই ছিলেন। হেষ্টিংস্ ও শ্রীমতী ইমৃহফের ভালবাসা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

হঠাৎ হেষ্টিংস্ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। নিজের সুখ-শান্তি, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া। শ্রীমতী তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় সকল সময়ই তিনি হেষ্টিংসের কাছে-কাছে থাকিতেন। জাহাজেই স্থির হইল যে, ইমৃহফ্ জার্ম্মেণীর বিচারালয়ে আবেদন করিয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইবেন এবং শ্রীমতী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হেষ্টিংস্‌কে বিবাহ করিবেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হেষ্টিংস্ ইমৃহফ্‌কে কিছু টাকা দিলে এবং শ্রীমতীর সন্তানদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।

ইমৃহফ্ স্বদেশের বিচারালয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করিয়া সস্ত্রীক হেষ্টিংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ মান্দ্রাজে রহিলেন, ইমৃহফ্‌কে স্ত্রী লইয়া সেখানে থাকিতে হইল। হেষ্টিংস্ কলিকাতায় আসিলেন, ইমৃহফ্‌ও সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর বিনিময়ে হেষ্টিংসের

নিকট হইতে প্রচুর টাকা পাইয়া ইমৃহফ্ দেশে ফিরিলেন তাহারও অনেক দিন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হওয়া খবর আসিল। তখন শ্রীমতী ইমৃহফ্‌কে সহধর্ম্মিণী করিয়া হেষ্টিংস্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানীর শাসন-প্রণালীতে এই সময় হইতেই একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। হেষ্টিংসের শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্মরণীয় যুগ লর্ড ক্লাইব যে-সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন হেষ্টিংস্ তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় ও তাহাকে অত্যন্ত প্রসারিত করেন।

৪

মহম্মদ রেজা খাঁ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলাদেশের দেওয়ান-সুবাদারের পদ লাভ করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ অতিরিক্ত উত্তমের সহিত রাজস্ব আদায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন ; এবং নবাবের চেয়েও অধিক আড়ম্বরে দিন কাটাইতে লাগিলেন। দেওয়ানের পদে মাত্র কয়েক বৎসর থাকিয়াই তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছিলেন। তিনি খুব চতুর ছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয় বলিয়া জিনিষটার তাঁহার একান্ত অভাব ছিল। টাকার নেশায় যাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য করে, যাহার বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় তাহার পক্ষে কোনরূপ অমানুষিকতাই অসম্ভব নয়। রেজা খাঁরও সেই অবস্থা হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন রেজা খাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। পাছে নন্দকুমার দেওয়ানী পান এ-আশঙ্কা রেজা খাঁর খুবই ছিল, সুতরাং নন্দকুমারকে রেজা খাঁ তাঁহার ঘোর শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন। এদিকে নন্দকুমারও রেজা

খাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কথা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংলণ্ডে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে রেজা খাঁ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কুক্রিয়ার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর দেওয়ানীর সময়ে ও কার্টিয়ার সাহেবের গভর্ণরীর আমলে বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০-৭১ খৃ:) বাংলাদেশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। সে-দুর্ভিক্ষের কথা এখনও প্রবাদবাক্যের মত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমাগত তিন-চারি বৎসর অনাবৃষ্টি. প্রজার ঘরের অন্ন ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাজস্ব আদায় করা চাই-ই চাই। টাকা ত আর ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই, তাহাতে দেশ থাকুক কিংবা শ্মশানেই পরিণত হোক্।

এদিকে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য সবই একচেটে। তাহার উপর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে—গভর্ণর ভেলেষ্ট সাহেবের সময়—কোম্পানী ধান-চাউলের ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছিল। একে দেশে দারুণ অন্নাভাব, তাহার উপর লক্ষ লক্ষ মণ ধান-চাউল কলিকাতায় গোলাবন্দী করিয়া রাখা হইল। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে খুব বেশী লাভে চাউল

বিক্রয় করিয়া বহু টাকা সঞ্চয় করিতে পারা যাইবে ইহাই ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

চাউলের দাম খুব চড়িয়া গেল। প্রজার ঘরে অন্ন নাই, অথচ টাকা আদায়ের জন্য জোর-জুলুম, উৎপীড়ন পূর্ণ-বেগেই চলিতে লাগিল। নিঃসহায় দরিদ্র কৃষক বীজধান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কর দিতে বাধ্য হইল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফসল একেবারেই হইল না। "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" বাংলায় মহাশ্মশানের করাল দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল; সোনার বাংলার বুকের উপর মহাকালের প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ হইল।

অনাবৃষ্টির জন্য শস্য না হওয়ায় কোম্পানীর ডিরেক্টর-দের মহা ভাবনা হইয়াছিল—যদি রাজস্ব আদায় না হয়। কিন্তু সেই সময় কলিকাতার গভর্ণর কার্টিয়ার সাহেব তাঁহাদের যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া লিখিলেন—মাভৈঃ, কোন ভাবনা নাই, বৃষ্টির অভাবে শস্য খুব কম হইলেও কর ঠিক মতই আদায় হইবে। কিন্তু বৎসর শেষ হইতে না হইতেই যে করাল মূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল পৃথিবীর আর কোনও দেশের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এক মুঠা ভাতের অভাবে প্রতিদিন তিলে তিলে শুকাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মরে এমন ভীষণ, এমন মর্ম্মান্তিক দৃশ্য

আর কোন দেশে কোন কালে কেহ দেখে নাই, ইহা কেবল এই "স্বর্ণপ্রসূ" বাংলাদেশেই সম্ভব হইয়াছিল।

মহম্মদ রেজা খাঁর হাতে তখন রাজ্যশাসনের ভার। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত নরনারীর বুক-ফাটা আর্ত্তনাদে তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিলেন না। প্রকাণ্ড প্রাসাদে দিব্য আরামে বাস করিয়া, রাজভোগ খাইয়া, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া, সুন্দরীকুলে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তিনি পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন—তাঁহার বিলাস-ব্যসনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না।

এদিকে ধনী-দরিদ্র সকলেরই সমান অবস্থা। ধনীর ঘরে যথেষ্ট টাকা আছে বটে, কিন্তু চাউল কোথায়? চারিদিকের সেই মরণ-কোলাহলের মধ্যেও জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া সিপাহীদের খোরাকীর জন্য কোম্পানী যত পারিয়াছে চাউল কিনিয়া রাখিয়াছে। সিপাহিগণ সন্তুষ্ট না থাকিলে যে রেজা খাঁর রাজস্ব আদায়ের উৎকট, পৈশাচিক উল্লাস—ভোগ-সুখ নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে না।

যাহারা কোনও দিন ঘর হইতে বাহির হয় নাই, সূর্য্যের মুখ দেখে নাই, সেই সব পুরস্ত্রী ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইয়াছে। দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বহুদূরের স্থান

হইতেও জীর্ণ কঙ্কালসার নরনারী একমুষ্টি অন্নের জন্য কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, কলিকাতায় গেলে অন্ন জুটিতে পারে, কারণ সেখানে ধনী আছে, কোম্পানী আছে—হয় ত সেখানে তাহারা আশ্রয় পাইবে। জীর্ণ-শীর্ণ মৃতপ্রায় মায়ের বুকের উপর ক্ষীণকায় শিশু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। ধনীদের অন্তঃ-পুরিকারা অঞ্চলে টাকা, মোহর, সোনার গয়না বাঁধিয়া "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া বাহির হইয়াছে, যদি সোনা দিয়াও এক মুষ্টি অন্ন মিলে। অন্ন কোথাও মিলিল না; পথেই অনেকে ইহলীলা শেষ করিল। দিন দিন কলিকাতা চলনশীল কঙ্কালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সন্তান মাকে জড়াইয়া ধরিয়া, আর মাও সন্তান বুকে করিয়া পথে ঘাটে সর্ব্বত্র অন্তিমশয্যায় শুইয়া আছে। যুবক, বৃদ্ধ—একে একে অনেকেরই ক্ষীণ প্রাণ-বায়ু বাহির হইল। এখানে-সেখানে অসংখ্য মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। এই দৃশ্য দেখিয়াও যাহাদের প্রাণ গলে নাই, তাহারা আর যাহাই হোক্ মানুষ নয়।

রেজা খাঁ অসীম বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াই দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় খুব বেশী দামে বিক্রয় করিবার আশায় তিনি তিন লক্ষ

মণ চাউল কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। চাউল যাহা পাওয়া যাইত তাহার দাম দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, দাম আরও বাড়িলে আরও বেশী লাভে ঐ চাউল বিক্রয় করিবেন। এই আশায়-ই তিনি চাউল বাহির করেন নাই, তাঁহার সাধ তখনও মিটে নাই, তখনও কর আদায় করিতে পারিবেন কিনা এই চিন্তা-ই তিনি করিতেছিলেন।

এদিকে প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া মহারাজ নন্দকুমারের গুরু মুর্শিদাবাদে মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গোলাবন্দী চাউল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সকল নবাবই এই তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। রেজা খাঁর ধারণা ছিল যে, কলিকাতার গভর্ণর এবং কাউন্সিলের সভ্যেরাও তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিলেন না এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পঞ্চাশ হাজার মণ চাউল কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কারণ যাহাই হোক্, রেজা খাঁর এই কাজ যে প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানুষের পৈশাচিকতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু এই চাউলের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার যেন সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ করাল মূর্ত্তি ধারণ করিবার পূর্ব্বেই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশের প্রায় সমস্ত চাউল কিনিয়া লয়। তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদের জন্য আনীত চাউল তাহাদের মধ্যে আদৌ বিতরণ না করিয়া, ঐ-চাউল বিতরণের সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল হিসাব দেখাইয়া, তাহারা উহা আত্মসাৎ করিত এবং অত্যধিক দামে তাহা বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হইতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। এই সকল নরপিশাচের কার্য্যাবলী মনুষ্য জাতির ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাহা হোক্, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া ইংলণ্ড হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। কলিকাতার কাউন্সিল কোম্পানীর বাঙ্গালী গোমস্তা প্রভৃতির ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ডিরেক্টরগণ কিন্তু কাউন্সিলের মিথ্যা কথায় ভুলিলেন না। তাঁহারা বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণই ইহার জন্য

দায়ী। তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয় দুরাচারদের নাম জানিতে চাহিলেন; কিন্তু কলিকাতার কাউন্সিল কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিলেন না। *

এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক লোক প্রাণত্যাগ করিল। কৃষিপ্রধান বাংলার কৃষককুল ধ্বংস হইল, বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিল। যাহারা প্রাণে মরিল না তাহারাও মৃতপ্রায় হইয়াই বাঁচিয়া রহিল।

দুর্ভিক্ষের পর কর আদায় করা খুব শক্ত হইয়া উঠিল। সারাটা দেশ ত উজার হইয়া গিয়াছে, টাকা দিবে কে? মহারাজ নন্দকুমার ইংলণ্ডে যে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে ডিরেক্টরগণ রেজা খাঁর অনেক কুক্রিয়ার কথাই জানিতে পারেন। রেজা খাঁ যে বহু কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন। তাহা ছাড়া, দুর্ভিক্ষের সময় মারাত্মক মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে তিন লক্ষ মণ চাউল কিনিয়া গোলাবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহারা পাইয়াছিলেন।

বাংলাদেশে কোম্পানীর বাণিজ্যের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেও এই সমস্ত সংবাদ

---

* Empire in Asia—W. M. Torrens.

প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য মিষ্টার ডাণ্ডাস ও কর্ণেল বারগয়ের মেম্বারের একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। ক্লাইব, ভেলেষ্ট, ভান্সিটার্ট এবং কার্টিয়ার—এইসব গভর্ণরের দুর্নীতি ও জঘন্য উৎপীড়নের কথা সাধারণের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ক্লাইব বুঝিলেন, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং অপরিমিত অর্থাগমের অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াও যদি শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার দেশবাসীর কাছে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার ও গঞ্জনাই লাভ করেন তবে তাহার চেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? সেইজন্য তাঁহার নামেও যখন ইংলণ্ডের মহাসভায় যথারীতি অভিযোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল তখন অবস্থা সঙ্গীন বোধে আত্মহত্যা করিয়া তিনি সমস্ত দায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গভর্ণর হইয়া আসিয়া মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি প্রকাশ্যে খুব বান্ধবতা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, কোন রকমে রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিতে পারিলে সেই পদে অন্য লোক নিযুক্ত না করিয়া নিজেই রাজস্ব আদায়ের ভার লইবেন। এদিকে ডিরেক্টরগণও রেজা খাঁর উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন। তাঁহারা রেজা খাঁ কোম্পানীর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়া নবাবী করিতেছেন এই অপরাধে অবিলম্বে তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিবার ও তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য হেষ্টিংস্‌কে আদেশ করিলেন। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য লইলে খুব সুবিধা হইবে ইহাও তাঁহারা জানাইলেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্‌ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে কোম্পানীর রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখনই নন্দকুমারের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়। সেই সময় হইতেই নন্দকুমারের প্রতি হেষ্টিংসের মনে একটা বিদ্বেষ-ভাব জন্মে। পরে তাহাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়।

৫

রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের গ্রেপ্তার

তখন গভীর রাত্রি। এমন সময় গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আদেশে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট মিডল্‌টন্‌ সাহেব বহু সিপাহী লইয়া রেজা খাঁর প্রাসাদ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেবের বংশীধ্বনিতে ও সিপাহীদের কোলাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য, ভোগসুখরত, নরপিশাচ খাঁ-সাহেব নিজের আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু মিডল্‌টন্‌ সাহেব তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন না; বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

রাজা সিতাব রায় তখন পাটনার দেওয়ান। তিনি কোম্পানীর খুব অনুগত ছিলেন, এমন কি ইংরাজদের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু তহবিল তস্রুফের অজুহাতে তাঁহাকেও বন্দী করিয়া

পাটনা হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। মহম্মা রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের গ্রেপ্তারে দেশময় আত উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস আপন কর্তৃত্বেই তাঁহাদে গ্রেপ্তার করেন—কলিকাতার কাউন্সিলের সভ্যেরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। বন্দী করিয়া যখ তাঁহাদের কলিকাতায় পাঠানো হইল তখন সভ্যে এই সংবাদ জানিতে পারিলেন।

হেষ্টিংসের এই কাজ করিবার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, দেওয়ান-সুবাদারে পদ তুলিয়া দিয়া নিজেই রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় লোকদের শাসন-সংক্রা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিবেন উভয় উদ্দেশ্যই তিনি সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

এখন রেজা খাঁর দোষ সপ্রমাণ করিবার জ নন্দকুমারকে হেষ্টিংসের বিশেষ দরকার হইল। তি নন্দকুমারকে পুনরায় বাংলার দেওয়ান করিবেন এইর প্রলোভন দেখাইয়া কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করি লাগিলেন। সিতাব রায়ের সঙ্গেও নন্দকুমারের সদ্ভ ছিল না। দিল্লীর মোগল বাদ্‌শা নন্দকুমারকে রা সম্মানে আপ্যায়িত করিবার জন্য তৎকালীন প্র

অনুযায়ী একখানি বহুমূল্য পাল্কী ও অন্যান্য উপহার-দ্রব্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌঁছিলে রেজা খাঁ অসন্তুষ্ট হইবেন আশঙ্কা করিয়া সিতাব রায় তাহা আটক করেন। ইহাই ছিল উভয়ের মনোমালিন্যের কারণ। হেষ্টিংসের ইচ্ছাক্রমে মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে নন্দকুমার নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু নন্দকুমারের সকল যত্ন সকল কষ্টস্বীকারই নিরর্থক হইল। প্রথমে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর অর্থলাভের প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া হেষ্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিলেন না। নানা ওজর দেখাইয়া রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিচার বন্ধ রাখিলেন। এদিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে চৌদ্দ মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর নিতান্ত রহস্যময় ভাবে দোষ সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়া প্রায় দুই বৎসর কারাবদ্ধ থাকিয়া রেজা খাঁ মুক্তি লাভ করিলেন। সিতাব রায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইলেন। হেষ্টিংস্ এবার দেওয়ান-সুবাদারের পদ একেবারে তুলিয়া দিয়া

কোম্পানীর পক্ষ হইতে নিজের হাতেই রাজস্ব আদায়ে
ভার গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁর দেওয়ান-সুবাদারী
গেলই, ঢাকাতে পূর্ব্বে তাঁহার যে-পদ ছিল তাহা
গেল। সিতাব রায়কে পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করা হই
বটে, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি আর সে-প
গ্রহণ করিলেন না। নিতান্ত হীন অপরাধীর ম
গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া তাঁহার বিচার করায় তি
মনে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে, কিছু দিনে
মধ্যেই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যা
করিলেন।

হেষ্টিংসের চাতুরীতে নন্দকুমার প্রতারিত হইলেন
দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যে-আশ
তিনি এত দিন ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন,
তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল। তাঁহার ভাগ্যে আর
দেওয়ানী লাভ করা হইয়া উঠিল না। নন্দকুমারকে
প্রতারিত করিলেও তাঁহাকে হেষ্টিংস্ ভয়ও করিতেন,
কারণ হেষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণের বিষয় সবই নন্দ-
কুমার জানিতে পারিয়াছিলেন। পাছে তিনি সকল কথ
প্রকাশ করিয়া দেন এই ভয়ে নন্দকুমারকে সন্তুষ্ট
রাখিবার জন্যই তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বাৎসরিক

এক লক্ষ টাকা বেতনে নবাবের গৃহকার্য্যের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া হেষ্টিংস্ একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাল চালিলেন। কিন্তু নন্দকুমারও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, হেষ্টিংসের এই চাল তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন।

৬

প্রধান বিচারালয় ও নূতন কাউন্সিল

তখন কলিকাতায় যে-বিচারালয় ছিল তাহার নাম ছিল মেয়র কোর্ট (Mayor Court)। লাল দীঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যেখানে বর্তমানে স্কচ্ গীর্জ্জা আছে সেইখানেই তখন এই মেয়র কোর্ট ছিল। ইংরাজে ইংরাজে, কিংবা ইংরাজে ও দেশীয় লোকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার বিচার হইত মেয়র কোর্টে। এই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বলা হইত মেয়র, আর অপর নয় জন বিচারককে বলা হইত অল্ডারম্যান্ (Alderman)। কলিকাতার বাঙ্গালীদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার বিচার হইত কাছারী আদালতে (The Court of Cutchery)।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতের ইংরেজ অধিকৃত দেশ সমূহে কর্ম্মচারীদের যথেচ্ছাচার

দূর করিয়া সুশাসন-সংরক্ষণ ও সুবিচার প্রবর্ত্তনের জন্য এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের নাম রেগুলেটিং এ্যাক্ট (Regulating Act)। এই আইনানুসারে কলিকাতায় সুপ্রীম্ কোর্ট (Supreme Court) নামে একটি প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হয়। সার ইলাইজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি এবং চেম্বার্স, লেমেইষ্টার ও হাইড্ এই তিন জন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আসেন। আর বাংলাদেশের গভর্ণর ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। সুতরাং হেষ্টিংস্ই ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার একটি কাউন্সিল হইল এবং সার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্, কর্ণেল মন্‌সন্, জেনারেল ক্লেভারিং ও বার্‌ওয়েল—এই চার জন কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

বড়লাটের এই সভায় এক বারওয়েল সাহেব ভিন্ন অপর তিনজনই ইংলণ্ড হইতে নূতন এ-দেশে আসিলেন। তাঁহারা স্পষ্টবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও উদারচেতা সভ্য ছিলেন বলিয়া হেষ্টিংসের যথেচ্ছ ব্যবহার কিছু বাধা পাইল। গভর্ণরের পদে থাকিয়া হেষ্টিংস্ যা-খুসীতা-ই করিতেন। বড়লাট হইয়াও তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা

প্রায় সমান ভাবেই বজায় ছিল, কিন্তু কাউন্সিলও তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ দিত, তাঁহার অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিত।

বারওয়েল সাহেব পূর্ব্ব হইতেই বাংলাদেশে ছিলেন, এবং অত্যাচার, অনাচার ও উৎকোচ-গ্রহণে পারদর্শী হইয়া শাসন-ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি ঢাকার তন্তুবায় এবং লবণ-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজে ধনকুবের হইয়াছিলেন। ঢাকার বস্ত্র ও লবণ-ব্যবসায়িগণ সর্ব্বস্ব হারাইয়া, একেবারে নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতা কাউন্সিলে অভিযোগ করিতে আসিলেন। বারওয়েল সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে খুব চমৎকার ব্যবহার করিলেন। যেহেতু তাঁহারা অভিযোগ করিতে আসিয়াছেন, সেহেতু তাঁহারা অপরাধী না হইয়াই পারেন না, এই যুক্তিবলে বারওয়েল সাহেব তাঁহাদের বন্দী করিলেন এবং একদল সিপাহী সঙ্গে দিয়া তাঁহাদের পুনরায় ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আরও দুইবার অভিযোগ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

এই উৎকোচগ্রাহী, অত্যাচারী বারওয়েল যে

হেষ্টিংস্‌কে স্তায়-অস্তায় সকল ব্যাপারেই নির্ব্বিবাদে সমর্থন করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। কাউন্সিলের অপর তিনজন সভ্য হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচার নিবারণ করিবার জন্ম যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া, যাহাতে উভয়ের সুপ্রচুর অর্থাগমের সুবিধা হয় বারওয়েল সেই চেষ্টাতেই একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ক্লাইব লবণের বাণিজ্যে কোম্পানীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কয়েক বৎসর পরে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা বন্ধ করিলে কি হইবে? অনায়াসে অর্থলাভের এমন সুযোগ, এমন অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হেষ্টিংস্‌ বোধ হয় তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিলেন। তাই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকারান্তরে আবার সেই একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিলেন। কলিকাতায় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ একটি বণিক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন লবণের ব্যবসায়ে একাধিপত্য কোম্পানীর পক্ষে রহিত হইয়া গেল, তখন এই বণিক সভাই লবণের বাণিজ্যের মূলধনী হইয়া এই অধিকার বজায় রাখিয়াছিল। হেষ্টিংস্‌ কার্য্যতঃ কোম্পানীকেই

মূলধনী করিয়া পুনরায় লবণের বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

আইনানুযায়ী কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কোনও বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই আইনের ব্যবস্থা বিফল করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত কোন কোন বাঙ্গালীর বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা লইয়া প্রকৃত পক্ষে নিজেরাই বাণিজ্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন।* বারওয়েল এই কর্ম্মে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বড় অনুগত, বড় প্রিয়—তাঁহার বেনিয়ান্ কান্ত পোদ্দার, কামালদ্দীন আলি খাঁ প্রভৃতির বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা লইয়া তাঁহারা অজস্র অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন।

অবিচার, অনাচার ত পূর্ব্বাবধিই ছিল, এই বাণিজ্যের ব্যাপারে দেশের লোককে আরও নানা রকমের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইল। যে-সকল ইংরাজ বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা লইতেন কোম্পানী তাঁহাদের অগ্রিম টাকা দিত। কিন্তু বারওয়েল সাহেবের বেনামীদারগণ কখনও

---

*Burke.

তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করিতে পারিতেন না। কোম্পানীর নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া তাহার বেশীর ভাগই বারওয়েল আত্মসাৎ করিতেন।

বড়লাটের কাউন্সিলে হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করিতেন। ক্লেভারিং, মন্‌সন্ ও ফ্রান্সিস্ তাঁহাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা বারওয়েলের এই ঘোর অন্যায় ও অত্যাচারেরও প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। হেষ্টিংস্ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চালে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, কাউন্সিল তাঁহাকে কিছুতেই সমর্থন করিবে না, তখন তিনি অন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের হাত করিয়া লইলেন। প্রধান বিচারপতি সার্ ইলাইজা ইম্পে হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বন্ধুর সম্ভ্রম প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য ন্যায়, বিবেক, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া জঘন্যতম কাজ করিতেও তিনি সঙ্কোচবোধ করেন নাই।* তাঁহার

---

* Macaulay.

ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে তিনিও যে বারওয়েল ও হেষ্টিংসের সমশ্রেণীর তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ থাকে না। অন্য বিচারপতিরা দুর্নীতিতে ইম্পের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য সহকর্ম্মী ছিলেন না।

পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের এই অত্যাচার প্রতিহত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। হেষ্টিংসের প্রতারণায় তাঁহার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। হেষ্টিংসের ঘোর অন্যায় আচরণ, উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি কু-ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

৭

নন্দকুমারের অভিযোগ

যে-সময় কোম্পানীর একজন সামান্য কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই দেশের কোন লোক সাহস করিত না সেই সময় ভারতবর্ষের বড়লাট দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজ, সাহস ও শক্তি কেবল-মাত্র মহারাজ নন্দকুমারই দেখাইতে পারিয়াছিলেন। বাংলাদেশের জমিদার-সম্প্রদায়ের উপরও তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতারও দরকার হইয়াছিল। দিনাজ-পুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া নন্দকুমারের বাড়ীতে সমবেত হইতেন এবং হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল সাহেবের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় চিন্তা করিতেন।

রাজস্ব আদায়ের ভার হেষ্টিংস্ নিজের হাতেই লইয়া-

ছিলেন এবং এই রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে তিনি জমিদারদের নানা রকমে নির্য্যাতন করিতেন। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু বারওয়েল মনে করিতেন যে, জমিদারগণের জমিতে কোনও স্বত্ব নাই, জমিদারীর প্রকৃত মালিক কোম্পানী, কারণ কোম্পানী দিল্লীর বাদ্‌শাহের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই জমি হইতে জমিদারদের উৎখাত করিয়া দিবার অধিকার কোম্পানীর আছে। কিন্তু সার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ভূমিতে জমিদারদের সীমাবদ্ধ অধিকার আছে এবং সেই অধিকার মোগল বাদ্‌শাগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের উৎখাত করিবার অধিকার কোম্পানীর নাই। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে হেষ্টিংস্ কোন কাজকেই অকরণীয় বলিয়া মনে করিতেন না এবং কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য প্রতিবাদ করিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী রংপুরের অন্তর্গত বাহেরবন্দ পরগণার জমিদার ছিলেন। বিনা অপরাধে হেষ্টিংস্ রাণীকে তাঁহার জমিদারী হইতে উৎখাত করিলেন। এবং নিজের অসদাচরণের প্রধান সহায় কান্ত পোদ্দারকে পুরস্কৃত

করিবার জন্য তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দীকে এই জমিদারী প্রদান করিলেন।

হেষ্টিংস্ জানিতেন যে, তাঁহার ধ্বংস-সাধনের জন্য নন্দকুমার নিজের গৃহে জমিদারদের লইয়া নানা পরামর্শ করিতেছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উৎকোচ-গ্রহণ এবং অনাচারের নিত্যসহচর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার, নবকৃষ্ণ মুন্সী, মোহনপ্রসাদ ও মুন্সী সদরদ্দী প্রভৃতিকে লইয়া তিনিও নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হইলেন।

হেষ্টিংস্ বেশই জানিতেন যে, একমাত্র নন্দকুমারকে বিনাশ করিতে পারিলেই বাংলাদেশে তাঁহার যথেচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার বা তাহা প্রতিরোধ করিবার মত লোক আর কেহ থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোক ভয়ে এমন বিহ্বল হইয়া পড়িবে যে, কেহ আর মাথা তুলিতে সাহস করিবে না। তাই তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কিংবা তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, যাহাতে সাক্ষী পাওয়া যায় এবং প্রমাণের অভাব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি নবকৃষ্ণ, মোহনপ্রসাদ প্রভৃতি ধূর্ত্ত

লোকদের বিশেষরূপে বাধ্য করিয়া রাখিলেন। দেশের সর্ব্বনাশ হয় হোক্, সে-দিকে এই হতভাগ্যদের একেবারেই দৃষ্টি ছিল না, শুধু হেষ্টিংসের মন জোগাইয়া, তাঁহার সেবা করিয়া ধনী হওয়াই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

হেষ্টিংস্ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। কাউন্সিলের সর্ব্বাপেক্ষা উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ ও স্পষ্টবাদী সভ্য সার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের নিকট মহারাজ নন্দকুমার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-পত্র প্রদান করিলেন। এই অভিযোগ-পত্রে হেষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণ ও অন্যান্য কু-ক্রিয়া বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছিল। তাহার সারমর্ম্ম এই—

"গভর্ণর জেনারেল্ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণ ও অন্যান্য অসদাচরণের কথা আমি আজ কাউন্সিলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি। এই অভিযোগ-পত্র পাঠ করিয়া কাউন্সিলের সভ্যগণ আমাকেও অসচ্চরিত্র বলিয়া মনে করিবেন, কারণ আমি সকল বিষয়ই জানিতাম, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। কিন্তু ইহা গোপন রাখিলে আমি আরও ঘোরতর অন্যায় করিব এবং আমার চরিত্র অধিক-তর কলঙ্কিত হইবে। হেষ্টিংস্ বাংলার শাসনকর্ত্তা,

ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং দায়ে পড়িয়া আমাকে তাঁহার অন্যায়ে, অত্যাচারে সহায়তা করিতে হইয়াছে।

"গভর্ণররূপে বাংলাদেশে আসিয়া, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের কোম্পানীর রাজস্ব খুব অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করিবার কথা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের পদচ্যুত করিয়া তিনি আমাকে নায়েব-সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সুতরাং তাঁহার অনুরোধে আমি রেজা খাঁর প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষা করি।

"মহম্মদ রেজা খাঁর প্রদত্ত হিসাব হইতে এবং তাঁহার আমলের অন্যান্য কাগজ-পত্র হইতে যখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি অন্যূন তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আমাকে দুই লক্ষ এবং হেষ্টিংস্‌কে এগার লক্ষ টাকা উৎকোচ দিবার প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংসের কাছে যখন আমি এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করি তখন তিনি ইহাতে ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করেন। রেজা খাঁ দোষী প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং এই উৎকোচের প্রস্তাব শুনিয়াও ইহারই কয়েক দিন পরে হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি

অত্যন্ত দয়াশীল হইয়া পড়িলেন। রেজা খাঁ মুক্তি লাভ করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, হেষ্টিংস্ রেজা খাঁয়ের নিকট খুব বেশী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"খুব অস্বাভাবিক রকম বেশী লাভের আশায়, দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়, মহম্মদ রেজা খাঁ যে বহু ধান কিনিয়া গোলাবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

"কোনও রকমের ত্রুটি বা অপরাধ না পাইয়াও রাণী ভবানীকে বাহেরবন্দের জমিদারী হইতে উৎখাত করিয়া নিজের বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের পুত্র লোকনাথ নন্দীকে হেষ্টিংস্ সেই জমিদারী দিয়াছেন।

"দিল্লীর বাদ্‌শাহ আমাকে একখানা বহুমূল্য পাল্কী উপহার দেন। সেই পাল্কী পাটনা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে সিতাব রায় তাহা আটক রাখেন। ইহার প্রতিকারের জন্য আমি হেষ্টিংস্‌কে বলি। হেষ্টিংস্ সেই পাল্কী পাটনা হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও তাহা আমাকে দেন নাই।

"আমার পুত্র মহারাজ গুরুদাসকে নায়েব-সুবাদারের পদে এবং মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবিকার পদে

নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস্‌ অনেক টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন।

"প্রথমতঃ আমার গোমস্তা চৈতন্যনাথ ও হেষ্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ এবং তাঁহার বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার প্রভৃতির মারফতে আমি তাঁহাকে তিন থলি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করি। ইহার প্রথম থলিতে ১৪৭১টি মোহর, দ্বিতীয় থলিতেও ১৪৭১টি মোহর এবং তৃতীয় থলিতে ৯৮০টি মোহর ও ৫৭০টি আধুলি ছিল। দ্বিতীয়-বার হেষ্টিংস্‌কে ১৪৭০টি মোহর প্রদান করা হয়।

"হেষ্টিংস্‌ মুর্শিদাবাদে গিয়া মণিবেগমকে নবাব মোবারকদ্দৌলার অভিভাবিকা ও নবাবের বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্রী নিযুক্ত করিয়া এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন এবং নবাবের গর্ভধারিণী বকুবেগমকে পদচ্যুত করেন। হেষ্টিংস্‌ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে মণিবেগম মহারাজ গুরুদাসের দ্বারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, গভর্ণর সাহেবকে দেয় বাকী দেড় লক্ষ টাকা কাহার দ্বারা তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আমি নিজে গিয়া হেষ্টিংস্‌কে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, কাশিমবাজারে কান্ত পোদ্দারের ভ্রাতা নূরসিংহের কাছে ঐ-টাকা দিতে হইবে। তাহার পর রাজা গুরুদাস

আমাকে লিখিয়া পাঠান যে, ঐ দেড় লক্ষ টাকা কাশিম-বাজারে নূরসিংহের কাছে দেওয়া হইয়াছে।

"হেষ্টিংসের এই সকল জঘন্য ব্যবহার আমি কাউন্সিলে এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে পারি বলিয়া তাঁহার একটা আশঙ্কা আছে এবং এই জন্যই তিনি আমার ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছেন। আমার পরম শত্রু মোহনপ্রসাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে তিনি হাতের পুতুল করিয়া রাখিয়াছেন। গভর্ণর জেনারেলের মত উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও মোহনপ্রসাদের মতন অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র একজন লোককে তিনি নিজের বাড়ীতে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পরামর্শ করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে মোহনপ্রসাদের খুব সমাদর চলিতেছে—যেন মোহনপ্রসাদ তাঁহারই সমকক্ষ লোক।"

আবেদন-পত্রে মণি-বেগমের নিয়োগ সম্বন্ধে যে-কথা উল্লিখিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মীর জাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্রকে হেষ্টিংস্ নবাব করেন। ডিরেক্টরগণ লিখিয়াছিলেন যে, একজন সুযোগ্য ও সৎলোককে যেন নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। হেষ্টিংস্ অনেক ভাবিয়া-

চিন্তিয়া একজন সুযোগ্য সৎলোক খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এই লোকটি নবাবের বিমাতা মণি-বেগম। নবাবের গর্ভধারিণী তাঁহার অভিভাবিকা হইতে পারিলেন না। মণি-বেগম যে কিরূপ সুযোগ্য ও সৎলোক তাহার পরিচয় দিতেছি। বিশু বেগ নামে একজন লোক প্রথমে তাঁহাকে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করে এবং নাচ-গান শিক্ষা দেয়। বিশু বেগের একটা বাইজীর দল ছিল, মণি-বেগম এই দলের একজন বিখ্যাত নর্ত্তকী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মণি। মণির ব্যবসায়ই ছিল বাইজীগিরি। একদিন এই মণি লম্পট-স্বভাব মীর জাফরের নয়নপথের পথিক হইলেন। তাঁহার নাচ-গানে ও সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া এক শুভ দিনে শুভক্ষণে মীর জাফর মণিকে অন্দরভুক্ত করিলেন। মণি তখন পর্দ্দানশীন হইয়া বেগমসাহেবা হইলেন এবং মীর জাফরের গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এহেন মণি-বেগমকে যদি হেষ্টিংস্ নবাবের অভিভাবিকা হইবার যোগ্যতমা পাত্রী বলিয়া বিবেচনা না করেন ত আর কাহাকে করিবেন ?—টাকায় সবই সম্ভব হয়।

হেষ্টিংস্ই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। এই অভিযোগ-পত্র কাউন্সিলে পাঠ করা হইলে, হেষ্টিংস্

ক্রোধে আত্মহারা হইলেন এবং ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া যাহা জবাব দিতে লাগিলেন, তাহাতে যুক্তি নাই, হিতাহিতজ্ঞানের পরিচয় নাই, আছে শুধু গভর্ণর হিসাবে তাঁহার জোর-জবরদস্তী। নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে সার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ ও জেনারেল ক্লেভারিংকে তিনি বলিলেন, "আমি বেশই বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনারাই নন্দ-কুমারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার বিরুদ্ধে এই হীন অভিযোগ আনিয়াছেন।"

ফ্রান্সিস্ উত্তর করিলেন—"ইহাতে ষড়যন্ত্রের কোন কথাই আসে না। যে-সকল অভিযোগের কথা এই আবেদনপত্রে আছে তাহা সত্য কি মিথ্যা সেইটি-ই তদন্ত করা উচিত।"

হেষ্টিংস্। নন্দকুমার অত্যন্ত বদ্‌লোক, ভয়ানক ধূর্ত এবং প্রতারক, তাহার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহার কোন তদন্তই হইতে পারে না।

জেনারেল ক্লেভারিং। মহারাজ নন্দকুমার সম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদায় এই দেশের একজন অতি প্রধান ব্যক্তি। তিনি বাংলাদেশের দেওয়ান-সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং পদগৌরবে তিনি আপনার চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহেন। আপনার বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ

উপস্থিত করিয়াছেন নিশ্চয়ই তাহার তদন্ত করিতে হইবে।

হেষ্টিংস্। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের তদন্ত করিলে এই মুহূর্ত্তেই আমি কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিব। মনে রাখিবেন, আমি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা—গভর্ণর জেনারেল। আমি কখনও অপরাধীর বেশে এখানে উপস্থিত হইব না।

কর্ণেল মন্‌সন্। আপনি যদি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হন তাহা হইলে ত আর আপনার পদের কোন মর্য্যাদা-হানি হইবে না, আপনার নিন্দাও হইবে না।

যুক্তিতে না পারিয়া, আর রাগ সাম্‌লাইতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া হেষ্টিংস্ বলিলেন—"আমি গভর্ণর জেনারেল, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত করিবার অধিকারই আপনাদের নাই।"

ফ্রান্সিস্। এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হইল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অসদাচরণ ও কুক্রিয়ার প্রতিকার করা। সেই জন্য কোম্পানীর যে-কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ হোক্ না কেন, তাহার তদন্ত করিতে হইবে।

হেষ্টিংস্। বেশ, আমি এই মুহূর্ত্তেই এই কাউন্সিল-গৃহ

ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। দেখি, আপনারা কি করিতে পারেন।

হেষ্টিংস্ ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে কাউন্সিল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার প্রিয় সহচর বারওয়েল 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' নীতি অবলম্বন করিয়া হেষ্টিংসের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। ফ্রান্সিস্ প্রমুখ অন্য তিনজন সভ্য অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমারকে কাউন্সিলে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন।

হেষ্টিংসের সকল রকম কুক্রিয়ার কথা নন্দকুমার খুব স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাবে বর্ণনা করিলেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অনেক সাক্ষীর নাম করিলেন, এমন কি হেষ্টিংসেরই বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারকেও সাক্ষী মানিলেন।

যে-সকল সাক্ষীর নাম নন্দকুমার করিয়াছেন, জবানবন্দী গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের ডাকিয়া পাঠানো দরকার। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য কান্ত পোদ্দারকেও ডাকিয়া পাঠানো হইল। কান্ত পোদ্দার হেষ্টিংসেরই খেলার পুতুল, হেষ্টিংস্-ই তাঁহার ইষ্টদেবতা, কাজেই হেষ্টিংসেরই কথা অনুসারে তিনি কাউন্সিলে উপস্থিত হইলেন না।

শুধু ইহাই নয়, উপরন্তু তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—হেষ্টিংস্ কাউন্সিলে না থাকিলে কাউন্সিল বসিতেই পারে না, সুতরাং এই নিতান্ত বে-আইনী কাউন্সিলে গিয়া সাক্ষ্য দিতে তিনি মোটেই বাধ্য নন।

সামান্য একজন বেনিয়ান্ কান্ত পোদ্দারের এই উদ্ধত উত্তরে সভ্যগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া হেষ্টিংস্-ই যে তাঁহাকে যন্ত্রের মত চালাই-তেছেন ইহাও তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। জেনারেল ক্লেভারিং আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কান্ত পোদ্দার যদি না আসে তবে তাহাকে চাবুক মারিব।"

এই কথা শুনিয়া হেষ্টিংস্ও বলিলেন—"যদি কান্ত পোদ্দারকে কেহ চাবুক মারে, তবে সে যেন মনে রাখে যে, আমি নিজে কান্তর পক্ষ হইয়া তাহাকেও চাবুক মারিব।"

এই কথায় ক্লেভারিং ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। ফ্রান্সিস্ ও মন্সন্ দেখিলেন যে, হেষ্টিংস্ ও ক্লেভারিং-এ ভীষণ মারামারি হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহার পরিণাম হয়ত অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে; তাই তাঁহারা অনেক চেষ্টায় অতি কষ্টে ক্লেভারিংকে নিরস্ত করিলেন।

ইহার পরই কাউন্সিল ভঙ্গ হইয়া গেল।

মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগ যে সত্য ইহা হেষ্টিংসের নিজের ব্যবহার দ্বারাই প্রমাণিত হইল। হেষ্টিংসের কান্ত পোদ্দারকে জবানবন্দী দিতে না দেওয়া, তাঁহাকে কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করিতে প্ররোচিত করা এবং কাউন্সিল ভঙ্গের চেষ্টা করিবার কারণই হইল অভিযোগের তদন্ত করিতে না দেওয়া, পাছে তাঁহার উৎকোচ-গ্রহণ ও কুক্রিয়া সকল কাউন্সিলে প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত হয়। যাহা হোক্, এক বার্ওয়েল ভিন্ন কাউন্সিলের অন্য তিন জন সভ্যই এই অভিযোগ সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। কিন্তু অপদস্থ হেষ্টিংসের নন্দকুমারের প্রতি আক্রোশ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

৮

ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত নন্দকুমার

হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের চিরশত্রু। কেবলমাত্র নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি বাহিরে নন্দকুমারের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই। প্রতারিত নন্দকুমার যখন কাউন্সিলে হেষ্টিংসের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবার উপক্রম করিলেন, তখন কোনরূপে মুখরক্ষার জন্য হেষ্টিংস্ কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন—এমন কি কাউন্সিলের সভ্যদেরও ভয় দেখাইলেন। ইহার পর নন্দকুমারকে অপদস্থ করিবার জন্য, শাস্তি দিবার জন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লর্ড ক্লাইবের ভূতপূর্ব্ব বেনিয়ান ও তাহার পরম অনুগত রাজা নবকৃষ্ণ, নিজের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার প্রভৃতিকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত

ভাবে কলিকাতার নানাস্থানে, নানালোকের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, আর প্রত্যহ বৈকালে হেষ্টিংসের বাড়ীতে তাঁহাদের গুপ্ত মন্ত্রণাসভা বসিতে লাগিল। শুধু ইহাই নয়, প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ ইলাইজা ইম্পের বাড়ীতে গিয়াও হেষ্টিংস্ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন প্রধান বিচারপতি, আবার কোন কোন দিন বা সকল বিচারপতিই, হেষ্টিংসের বাড়ীতে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিবিধ প্রকার যুক্তি করিতেন। হেষ্টিংস্ ও তাঁহার সহচরদের এখন আর এক মুহূর্ত্তও অবসর রহিল না।

এই প্রসঙ্গে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের একজন বিশেষ অনুগত সহচর—বন্ধু। একটি ঘটনার উল্লেখেই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। দিনাজপুরের রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারই রাজা হইবার কথা ছিল। রাজার একটি নাবালক পুত্র ছিল। হেষ্টিংস্ এই নাবালককে রাজা করিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দালালীতে ও মারফতে হেষ্টিংস্ এইজন্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা-গোবিন্দকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কর-আদায়-কমিটির দেওয়া

যুক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার উপর কর-
াদায়ের ভারও অর্পণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া
ংলাদেশে কাহার কি সম্পত্তি আছে, জমা-জমি দলিল-
ত্র আছে, তাহা জানিবার ও পরীক্ষা করিবার জন্য
ষ্টিংস্ একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির নাম
ল আমিনী-কমিটি। গঙ্গাগোবিন্দের উপরেই তিনি এই
মিটির সমস্ত ভার দিয়াছিলেন। এই কার্য্য উপলক্ষে
ওয়ানজীর অত্যাচার দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে বিষম
াসের সঞ্চার করিয়াছিল। গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্র যে
ত্যন্ত খারাপ ছিল, তিনি যে দেশের লোকের চক্ষুশূল
লেন, ইহা জানিয়া-শুনিয়াও হেষ্টিংস্ তাঁহাকে ঐ
ায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই
য়, তাঁহাকে হেষ্টিংস্ প্রচুর জমিদারী বন্দোবস্ত
য়াছিলেন। এক কথায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন
হষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণের দালাল। * এই কারণেই
হষ্টিংস্ তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি যখন
ারতবর্ষ থেকে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন তখনও
াহাজে বসিয়া কেবল গঙ্গাগোবিন্দের কথাই বলিয়াছিলেন,
বং বহু বৎসর পরে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া গিয়াও

* Burke.

টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহা হইতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছাব্বিশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই টাকা আদায় করিবার জন্য কলিকাতায় মহারাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করি। ঐ-টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে দুইখানি দরখাস্ত লিখিয়া মহারাজ নন্দকুমারের নিকট প্রদান করি। আর সেই টাকা আদায় করিয়া দিতে পারিলে মহারাজ নন্দকুমারকে ছয় হাজার টাকা দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হই।

"মুন্সী সদরুদ্দীন এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে দরখাস্ত দিতে নিষেধ করেন এবং আপোষে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। আমিও তাহাতেই সম্মত হইয়া মহারাজ নন্দকুমারের কাছে দরখাস্তগুলি ফেরৎ চাই, কিন্তু তিনি উহা ফেরৎ না দিয়া আমাকে জোসেফ্ ফাউকের নিকট পাঠান এবং তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণ রায়কে আমার সঙ্গে যাইতে বলেন। আমরা ফাউকের বাড়ীতে যাই।

"ফাউক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'লবণের মহাল ইজারা পাইবার জন্য তুমি কোন কোন ইংরাজকে ঘুষ দিয়াছ কি না?'

"আমি বলি—'না।'

"ফাউক বলিলেন—'না, তুমি দিয়াছ।'

"তাহার পর ফাউকের পুত্র ফ্রান্সিস্ ফাউক আসেন। পিতাপুত্রের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহাদের কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা আমাকে পরদিন পুনরায় যাইতে বলেন। পরদিনও আমি যাই। ফাউক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি ভান্সিটার্ট সাহেবকে ঘুষ দিয়াছ কি না?'

"আমি বলি—'না, ঘুষের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।'

"ফাউক আমার উপর অত্যন্ত চটিয়া যান। তিনি ও তাঁহার পুত্র ইংরাজীতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলেন। সেদিনও আমি চলিয়া আসি।

"তৃতীয় দিন আমি যখন যাই তখনও ফাউক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'বল, তুমি ঘুষ দিয়াছ কি না?'

"আমি বলি—'আমি কাহাকেও ঘুষ দিই নাই।'

"ফাউক বলেন—'তুমি যা-তা বলিতেছ, মিথ্যা কথা বলিতেছ।'

"আমি বলি—'দেখুন, আমি ইজারাদার—মিথ্যা কথা আমি বলি না, আমি চোর নই।'"

সার্ ইলাইজা ইম্পে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর তার পর ?"

উৎসাহিত হইয়া কামালদ্দীন আবার বলিতে লাগিল—"ইহার পর ফাউক সাহেব আমাকে নানারূপ ভয় দেখাইয় হেষ্টিংস্ ও বার্ওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ করিয়া দরখাস্ত লিখিতে বলেন। আমি ঐরূপ দরখাস্ত লিখিতে অসম্মত হইলে ফাউক ও মহারাজ নন্দকুমার আমাকে কয়েদ করিতে উদ্যত হন। ভয়ানক ভয় পাইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়ি।"

ইম্পে। তার পর তুমি কি করিলে ?

কামাল। আমি বাড়ী চলিয়া আসি এবং এই বিষয় ক্রমাগত চিন্তা করিতে থাকি। ভাবিলাম, গভর্ণর সাহেব নিশ্চয়ই আমার উপর ভয়ানক চটিবেন। তার পর মহারাজ নন্দকুমার ও ফাউক প্রভৃতির নামে অভিযোগ করিয়া একখানা দরখাস্ত লিখি এবং উহা গভর্ণর সাহেবের কাছে পেশ করিয়া মুখে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলি। গভর্ণর বলিলেন—'তুমি ত মুখে অনেক কথাই বলিতেছ, কিন্তু দরখাস্তে ত সে-সব কথা কিছুই লিখ নাই। সকল কথা দরখাস্তে লিখ, আমি তদন্ত করিব।'

"আমি বলিলাম—'আমার মুন্সী ত এখন সঙ্গে নাই, আমি কাল লিখাইয়া লইয়া আসিব।'

"গভর্ণর বলিলেন—'তোমার মুন্সী যদি সঙ্গে না-ই থাকে আমার মুন্সী ত আছে, সে-ই লিখিয়া দিবে।'

"তার পর গভর্ণরের মুন্সীই আমাকে দরখাস্ত লিখিয়া দিল। আমি দরখাস্তখানি গভর্ণরের হাতে দিলাম, তখন তিনি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।"

জোসেফ্ ফাউক ছিলেন একজন অনুবাদক বা দো-ভাষী (Interpreter)। দুই পক্ষের দরখাস্ত সম্বন্ধেই তিনি অনুসন্ধান করিতেন। এই কাজ বড়ই দায়িত্বপূর্ণ ছিল, কারণ যাঁহারা বাংলা বুঝিতেন না তাঁহাদের মামলা-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি ও সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া এবং যাঁহারা ইংরাজী একেবারেই বুঝিতেন না তাঁহাদের দেশীয় ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়াই ছিল এই দো-ভাষীদের কাজ। ন্যায়নিষ্ঠ না হইলে ইঁহাদের দ্বারা তখন যথেষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল। তখন আমাদের দেশের লোক কেহই ইংরাজী জানিতেন না বলিলেই চলে, সুতরাং এই দো-ভাষী যদি কোন এক পক্ষের সুবিধার জন্য বিচারককে নিজের ইচ্ছা মত যা-খুসী-তাই বুঝাইয়া দিতেন, কিম্বা দেশীয় কথার অসঙ্গত

অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে বিচার-ফলও সেইরূপই হইত।

কিন্তু জোসেফ্ ফাউককে সকলেই খুব ন্যায়-নিষ্ঠ বলিয়া জানিত। উপরন্তু তিনি খুব সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। হেষ্টিংস্, ভান্সিটার্ট, বারওয়েল প্রভৃতির অশেষবিধ অনাচারের কথা তিনিও জানিতেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারাও ইহা প্রকাশিত হইবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই হেষ্টিংস্ তাঁহার উপর একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না। তাই তাঁহাকেও যে-কোন রকমেই হউক অপদস্থ করিবার জন্য ইলাইজা ইম্পের সহিত পরামর্শ করিয়া হেষ্টিংস্ কামালদ্দীনের দ্বারা এই অভিযোগ উপস্থিত করাইলেন। তাহা না হইলে, কামালদ্দীনের মত লোককে লইয়া, নিভৃতে নিজের কক্ষে বসিয়া, ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পরামর্শ করিবেন কেন? আর নিজের মুন্সীকে দিয়া, নিজের গৃহে বসিয়া, কামালদ্দীনের দরখাস্তই বা লিখাইয়া দিবেন কেন? কামালদ্দীন এমনই সংলোক ছিল যে, হেষ্টিংস্ও তাহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না। পাছে সে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া পুনরায় মহারাজ নন্দকুমারের অনুগত হয় এই আশঙ্কায়ই হেষ্টিংস্ নিজের মুন্সীর দ্বারা তাহার দরখাস্ত লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

কামালদ্দীন যখন হেষ্টিংসের বাড়ীতে যায় এবং এই দরখাস্ত লইয়া কথাবার্ত্তা হয়, তখন ভান্সিটার্ট সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

কামালদ্দীনের অভিযোগের প্রত্যুত্তর ও প্রতিবাদ স্বরূপ জোসেফ্ ফাউক একখানা লিখিত-বর্ণনা দাখিল করেন। তাহাতে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে কামালদ্দীনকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামাল-দ্দীনের দরখাস্তে উল্লিখিত অভিযোগ যে সর্ব্বৈব মিথ্যা ইহাই ছিল তাঁহার জবাবের সারমর্ম্ম। তিনি এই সম্পর্কে কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট একখানা চিঠি লিখেন। সেই চিঠির সঙ্গে কামালদ্দীনের প্রথম দরখাস্তখানাও তিনি পাঠাইয়া দেন। এই দরখাস্তখানাই হেষ্টিংস্ পড়িয়া দেখিয়াছিলেন যে, ইহাতে অভিযোগের বিষয় খুব ভাল করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই এবং নিজের মুন্সীর দ্বারা তাহা নূতন করিয়া ও বিশদভাবে লিখাইয়া দিয়াছিলেন। ফাউকের চিঠির মর্ম্ম এই—'কামালদ্দীন আমার হাতে আরও একখানা দলিল দিয়াছে। আমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা ইহার দ্বারা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। ইহাতে লিখিত আছে যে, সাধারণের কাছে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার ও আমার অপযশ

রটাইবার উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেল অন্যায় ভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই দলিলের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে কামালদ্দীনের হীন প্রকৃতির কথা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়—তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিতই হইব। আমার বিরুদ্ধে প্রথমে কামালদ্দীন যাহা বলিয়াছে তাহা গভর্ণর জেনারেল বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন—সুতরাং তাহার আগেকার উক্তির প্রত্যাহারও সেই উক্তির সহিত নথিভুক্ত হউক ইহাই আমার অনুরোধ। এই সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের নামের উল্লেখ করিতে হইল বলিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত। কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ কেবলমাত্র ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই তাহা করিতে বাধ্য হইলাম।'

এইখানে ইহাই দেখিবার বিষয় যে, কামালদ্দীন আলি খাঁ কোম্পানীর লোক ত বটেই, সে হেষ্টিংসেরও লোক। মহারাজ নন্দকুমার যে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন এবং হেষ্টিংসের সঙ্গে যে তাঁহার বিষম মনোমালিন্য চলিতেছে ইহাও কামালদ্দীনের নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি বরাবর কাউন্সিলে গিয়া নালিশ না করিয়া সে দরখাস্ত লইয়া নন্দকুমারের কাছে

আসিল কেন? হেষ্টিংসের বাড়ীতে সে প্রায়ই যাইত এবং তাঁহাকে সকল কথাই বলিত। যাহাতে হেষ্টিংসের কোন কার্য্যে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয় ইহাই কামালদ্দীনের লক্ষ্য ছিল। কামালদ্দীনের নিজের কথায়ই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল না। তাহার সে-ইচ্ছা থাকিলে সে নাকি সত্য কথাই দরখাস্তে লিখিত, যা-খুসী-তা লিখিত না। শুধু গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহকে একটু ভয় দেখাইবার জন্যই না কি তাঁহার বিরুদ্ধে একখানা দরখাস্ত লিখিয়া সে নন্দকুমারের হাতে দিয়াছিল। আর এক কথা, যদি ইহাতে হেষ্টিংসেরই কারসাজি না থাকিবে, তবে কামালদ্দীনকে এই অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি অত উপদেশ দিলেন কেন? নিজের বাড়ীতে বসিয়া, নিজের মুন্সীকে দিয়া বিস্তারিত দরখাস্ত লিখাইয়া লইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? যাহা হোক্, এই মোকদ্দমা করিবার জন্য হেষ্টিংসের অত আগ্রহ কেন হইয়াছিল তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি একজন চোব্‌দার সঙ্গে দিয়া কামালদ্দীনকে প্রধান বিচার-পতির বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। অধিকন্তু তাহার বক্তব্য অনুবাদ করিয়া প্রধান বিচারপতিকে বুঝাইয়া দিবার

জন্য সার্ জন ডি-অয়লি (D' Oyley) নামে একজন উচ্চপদস্থ সাহেবকে তাঁহার নিজের কাজে বাহির হইতে না দিয়া কামালদ্দীনের সঙ্গে পাঠান। শুধু ইহাই নয়, নিতান্ত গর্হিত হইলেও তিনি নিজে এই সম্পর্কে সার্ ইলাইজা ইম্পের কাছে একখানি চিঠি লিখেন এবং নিজেরই একজন ভৃত্যের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দেন। হেষ্টিংসের এই অন্যায় ও বে-আইনী ব্যবহারের প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া ইম্পে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন—তিনি কামাল-দ্দীনের সকল কথাই শুনিলেন এবং অন্যান্য বিচারপতি-দের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঐদিন বৈকালে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ কামালদ্দীনকে জেরা করিলেন এবং মহারাজ নন্দকুমার, জোসেফ্ ফাউক, ফ্রান্সিস্ ফাউক ও রাধাচরণ রায়ের উপর তার পর দিন সার্ ইলাইজা ইম্পের বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি করিলেন।

সার্ ইলাইজা ইম্পে ও অপর বিচারপতিগণ স্থির করিলেন যে, জোসেফ্ ফাউকের পুত্র ফ্রান্সিস্ ফাউকের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনরূপ প্রমাণ নাই, সুতরাং তাঁহার নামে মোকদ্দমা চলিতে পারে না। মহারাজ নন্দকুমার, জোসেফ্ ফাউক এবং রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে

হেষ্টিংস্, ভান্সিটার্ট ও বারওয়েল ইচ্ছা করিলে অভিযোগ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের তিন দিন সময় দেওয়া হইল।

যথাসময়ে হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল মহারাজ নন্দকুমার, জোসেফ্ ফাউক ও রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম-কোর্টে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। § পাছে কামালদ্দীন আবার কোনরূপ গোলামাল করে এইজন্য হেষ্টিংস্ একাধিকবার তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া জেরা ইত্যাদি করিয়া ভালরূপ তালিম দিয়া রাখিলেন। *

---

§ বেভারিজ বলেন, বারওয়েল অভিযোগ করেন নাই, অভিযোগ করিয়াছিলেন ভান্সিটার্ট।

* Beveridge—Trial of Maharaja Nanda Kumar.

৯

চক্রান্ত

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হেষ্টিংস্, বারওয়েল, কান্ত পোদ্দার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হেষ্টিংস্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নন্দকুমার যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা চাপা দেওয়া হইলই, পরন্তু তাহারই প্রতিষেধকরূপে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কত ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রস্তুত করা হইল, কিন্তু তাহাও যে বিফল হইতে চলিল! তখন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিরা ষড়যন্ত্রের বিচার মুলতুবা রাখিলেন, তখনও ইহার সম্বন্ধে তাঁহারা কোন স্থির-সিদ্ধান্তে আসেন নাই। কাজেই হেষ্টিংস্ ও তাঁহার সহচরগণ নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, নানারূপ মৎলব আঁটিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ নন্দকুমারও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন না। তিনিও হেষ্টিংসের নিত্যনূতন অপকর্ম্মের কথা

ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলার জমিদারদের লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দশ-পনোরো দিন কাটিতে না কাটিতেই একটি অভিনব, অদ্ভুত এবং অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার সংঘটিত হইল।

সেদিন ৬ই মে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ। তখন রাত্রি ১০টা। এই সময়ে হঠাৎ মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক গ্রেপ্তারি পর্ওয়ানা বাহির হইল। সেই রাত্রেই নন্দকুমার গ্রেপ্তার হইলেন। কিন্তু তিনি যে কি অপরাধে অপরাধী তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না, অন্য কেহও কিছু বুঝিতে পারিল না। সেই রাত্রেই সমস্ত কলিকাতায় এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই অবাক্, সকলেরই মুখে, চোখে একটা ভীতি ও বিস্ময়ের ভাব। সকলেই ভাবিতে লাগিল—মহারাজ নন্দকুমারের মত লোক এমন কি কাজ করিতে পারেন যে, রাত্রে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল?

ইহার পর আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল—নন্দকুমারকে জামিনে খালাস দেওয়া হইল না। তিনি সেই রাত্রেই কারাগৃহে আবদ্ধ হইলেন। তখনও তাঁহার বিরুদ্ধে অভি-যোগের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। ইহাতে দেশের লোক অধিকতর সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

পরে জানিতে পারা গেল যে, মোহনপ্রসাদ নামে মহারাজ নন্দকুমারের এক ভীষণ শত্রু এবং হেষ্টিংসের পরম ভক্ত, নন্দকুমার জাল দলিল তৈরী করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করিয়াছে—আর সেই অপরাধেই বিচারপতিরা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া নন্দকুমারকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

মোহনপ্রসাদের অভিযোগ-পত্রে বুলাকিদাস সম্বন্ধে অনেক কথা রহিয়াছে। এই জালের অভিযোগ বস্তুতঃ বুলাকিদাসকে লইয়াই, সুতরাং প্রথমে বুলাকিদাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১০

বুলাকিদাস

বুলাকিদাস শেঠ ছিলেন একজন হিন্দুস্থানী আগড়ওয়ালা। তখন মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান। তাই বুলাকিদাস ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে আসেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও সকলের কাছে সুপরিচিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ নন্দকুমার তখন মীর জাফরের দেওয়ান ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেও মুর্শিদাবাদে থাকিতে হইত। প্রথমে আলাপ-পরিচয়, তার পর ক্রমে ক্রমে বুলাকিদাস নন্দকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমশঃ বুলাকিদাসের ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল এবং তিনি এত ধনশালী হইয়া উঠিলেন যে, পরিশেষে তিনি নবাব মীর কাশিমের পোদ্দার হইলেন, স্বয়ং নবাবের সহিতও তাঁহার টাকার আদান-প্রদান চলিতে লাগিল।

বাংলাদেশের ঢাকা প্রভৃতি অনেক জেলাতেই তাঁহার বড় বড় ব্যবসায় ছিল, বাংলার বাহিরে কাশীতেও তাঁহার বিস্তৃত কারবার ছিল। তাঁহার বহু কর্ম্মচারী ঐ-সকল স্থানে কাজ করিত।

তিনি নন্দকুমারকে খুব ভালবাসিতেন, খুব শ্রদ্ধা করিতেন। আপদে বিপদে সম্পদে নন্দকুমারের পরামর্শ না লইয়া তিনি কোনও কাজ করিতেন না। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল এই যে, তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণেরও অভাব ছিল না।

* * * *

হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইবার পর নন্দকুমারের সহিত তাঁহার গুরুর সাক্ষাৎ হয় নাই। গুরুপত্নীকে তিনি মায়ের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং পুত্রহীন গুরুর একমাত্র কন্যাকে তিনি সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। সাত-আট বৎসর তাঁহাদের কোন খোঁজ-খবর লওয়া হয় নাই। তাই তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার তখন যথেষ্ট অর্থ, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি হইয়াছে, সুতরাং তিনি ভাবিলেন, গুরুর বাড়ীতে গিয়া গুরুপত্নী ও গুরু-কন্যাকে মূল্যবান অলঙ্কার উপহার প্রদান করিবেন। বড়

আশা করিয়া মণি-মুক্তা-খচিত বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া তিনি গুরুর সহিত দেখা করিতে গেলেন ; কিন্তু সেখানে গিয়া জানিলেন, গুরুপত্নী দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং গুরুকন্যা বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণে ভয়ানক আঘাত লাগিল। ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া ঐ অলঙ্কারের কি ব্যবস্থা করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন, তিনি আর সে-অলঙ্কার নিজে লইবেন না, তাঁহার বন্ধু বুলাকিদাস শেঠের কাছে উহা রাখিয়া দিবেন। তাঁহার গুরুকন্যাই প্রকৃতপক্ষে ইহার অধিকারিণী, সুতরাং তাঁহার টাকার দরকার হইলে তাঁহাকে ইহা হইতে টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বুলাকিদাসের কাছে গেলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া অলঙ্কারগুলি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। তার পর বুলাকিদাসকে ইহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়ের টাকাটা সুদে খাটাইয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

মীর কাশিমের সঙ্গে যখন ইংরাজদের বিরোধ উপস্থিত হইল এবং এই বিরোধেরই ফলে যখন বক্সারে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বুলাকিদাস তখন মীর কাশিমের সঙ্গেই ছিলেন। মীর কাশিম যুদ্ধে

পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে বুলাকিদাস সেখান হইতে চলিয়া আসেন। তিনি মীর কাশিমের বিশেষ অনুগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপরও নানারূপ অত্যাচার হইল। তিনি ও তাঁহার হিসাব-রক্ষক কৃষ্ণজীবন বন্দী হইলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ তখন ঢাকায় কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার সহিত বুলাকিদাসের একেবারেই সদ্ভাব ছিল না। এইবার তিনি প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইলেন। মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই রেজা খাঁ বুলাকিদাসের ঢাকার কারবার ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি আটক করিলেন। বুলাকিদাসের মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়েরও ঐরূপই গতি হইল। মীর কাশিমের সঙ্গে থাকাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

মাসাধিক কাল নজরবন্দী থাকিয়া বুলাকিদাস মুক্তি পাইলেন এবং বারাণসীতে আসিয়া পলাতক অপরাধীর মত গোপনে বাস করিতে লাগিলেন—বাংলাদেশে আসিতে সাহস করিলেন না। কিছুদিন পরে শ্যামলাল নামে একজন লোককে কলিকাতার কালেক্টর গ্রে-সাহেবের নিকট পাঠাইয়া তিনি বাংলাদেশে

ফিরিয়া আসিবার অনুমতি চাহেন। গ্রে-সাহেব অনুমতি দিলেন, কিন্তু ক্লাইব ইহাতে ভয়ানক চটিয়া গেলেন। ইহার একটা বিশেষ কারণ ছিল—বুলাকিদাস কোম্পানীর কাছে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পাইতেন, সেই টাকার দাবী করাই হইল তাঁহাকে বাংলাদেশে আসিতে না দেওয়ার গূঢ় কারণ। যাহা হোক্, ক্লাইবের পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর স্পেন্‌সার-সাহেবের নিকট হইতে বুলাকিদাস বাংলাদেশে ফিরিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইব তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্লাইবের নিজের চিঠি পাইয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ক্লাইবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া গ্রে-সাহেবকে চাকরী ছাড়িতে হইল।

বক্সারের যুদ্ধের সময় বুলাকিদাসের অন্যান্য সকল সম্পত্তির সহিত মহারাজ নন্দকুমারের বিক্রয়ার্থ গচ্ছিত অলঙ্কারও লুট ও বাজেয়াপ্ত হয়। এই অলঙ্কারের মূল্য হিসাব করিয়া বুলাকিদাস নন্দকুমারকে ৪৮,০২১ টাকার একখানা দলিল লিখিয়া দিলেন। টাকা দিবার সামর্থ্য থাকিলে তিনি দলিল লিখিয়া দিতেন না, কিন্তু তখন তাঁহার সেরূপ অবস্থা ছিল না।

কিছুদিন পরেই বুলাকিদাসের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহাকে দেখিতে যান। নন্দকুমারের প্রতি বুলাকিদাসের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, বিশ্বাস ছিল; তাই তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং পালিত পুত্র পদ্মমোহনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লওয়ার জন্য তিনি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন, আর তিনি যে কোম্পানীর কাছে ২,৩০,০০০৲ টাকা পাইবেন সেই টাকা হইতে নন্দকুমারের প্রাপ্য টাকা লইতে বলেন। ইহা ছাড়া, তিনি নন্দকুমারকে এই মর্ম্মে একখানা লিখিত করারনামা (agreement or pact) দেন—'কোম্পানীর কাছে আমার ২,৩০,০০০৲ টাকা পাওনা আছে, আপনি যদি সেই টাকা সুদ সমেত আদায় করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণর-সাহেব, মিষ্টার বাউটন্ এবং মিষ্টার পিয়ার্সনকে তাহার অর্দ্ধেক দিব। যদি তাঁহারা এই টাকা নিতে রাজী না হন, তবে আপনাকে ঐ-টাকার অর্দ্ধেক (মোট টাকার চতুর্থাংশ) দিব। আপনার অলঙ্কার বাবদ প্রদত্ত খতের উল্লিখিত সুদের সমস্তটা আমি দিতে পারিব না, তাহার এক চতুর্থাংশ মাত্র দিব। যদি কোম্পানীর নিকট হইতে সুদ আদায় না হয়, শুধু আসল ২,৩০,০০০৲ টাকা আদায় হয়, তাহা

হইলেও গভর্ণর ও পিয়ার্সন-সাহেবকে আমি ১,০০,০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য আছি। যদি তাঁহারা উহা গ্রহণ না করেন, তবে ঐ এক লক্ষের অৰ্দ্ধেক আপনাকে দিব। গভর্ণর টাকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার কাছে শপথ করিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার এই টাকা গ্রহণের কথা কেহ জানিতে পারিবে না।'

এই করারনামায় সংগ্রামলাল, মোহনদাস এবং চৈতন্যচরণ নাথ নামে তিনজন সাক্ষী ছিল। বুলাকি-দাস ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে এই করারনামা দেন।

বুলাকিদাস ৪৮,০২১৲ টাকার যে-খত দিয়াছিলেন, সেই খত জাল করিবার অভিযোগেই মহারাজ নন্দকুমার অভিযুক্ত হইলেন।

১১

জাল দলিলের অভিযোগ

বুলাকিদাসের সমস্ত সম্পত্তির দুই জন আম্‌মোক্তার ছিল—একজন তাঁহারই পালিতপুত্র পদ্মমোহন, আর এক-জন মোহনপ্রসাদ। এই জাল দলিলের অভিযোগে মোহনপ্রসাদই ছিল ফরিয়াদী। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে-বর্ণনা সে তাহার দরখাস্তে দিয়াছিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ—

"আমার নাম মোহনপ্রসাদ। আমি বুলাকি-দাসের অছি (ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী) গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গুলালের আম্‌মোক্তার (Attorney)। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বুলাকিদাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একখানা দানপত্র সম্পাদন করেন; সেই দান-পত্র অনুসারে তাঁহার পালিত-পুত্র পদ্মমোহন তাঁহার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পান। তিনি পদ্মমোহন ও আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির আম্‌মোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রায় তিন বৎসর হইল পদ্মমোহন পরলোক

গমন করিয়াছেন। এখন আমিই মৃত বুলাকিদাসের সম্পত্তির দেনা-পাওনার হিসাবপত্র রাখি, আদায়-উশুল করি। আদায়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে আমি তহরী পাইয়া থাকি।

"মহারাজ নন্দকুমার বুলাকিদাসের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে আসেন। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও পদ্মমোহনের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার গ্রহণ করিবার জন্য বুলাকিদাস নন্দকুমারকে সকাতর অনুরোধ করেন। নন্দকুমারের সহিত বুলাকিদাসের দেনা-পাওনাও ছিল। নন্দকুমার তাঁহার কাছে কিছু টাকাও পাইতেন। বুলাকিদাস তাঁহার কোম্পানীর খত বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে সেই টাকা লইতে বলেন। গঙ্গাবিষ্ণু ও পদ্মমোহনকে লইয়া নন্দকুমার হেষ্টিংসের বাড়ীতে যান এবং সেইখান হইতে বুলাকিদাসের কোম্পানীর কাগজ আনিয়া নিজের কাছে রাখেন।

"বুলাকিদাস প্রদত্ত আম্‌মোক্তারনামায় মহারাজ নন্দকুমার কেবলমাত্র দশ হাজার টাকা পান বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গাবিষ্ণুকে আমি তাহা দেখাই। কয়েক দিন পরেই গঙ্গাবিষ্ণু ও আমাকে সঙ্গে করিয়া পদ্মমোহন দেনা-পাওনা পরিষ্কার করিবার জন্য মহারাজ

নন্দকুমারের কাছে গেলেন। নন্দকুমার বুলাকিদাসের প্রদত্ত বলিয়া তিনখানা খতের উপরিভাগ ছিঁড়িয়া পদ্ম-মোহনের হাতে দিলেন। সেই তিনখানা খতের পাওনা টাকা বাবদ বুলাকিদাসের সতেরখানা কোম্পানীর খত হইতে আটখানা নিজের কাছে রাখিলেন। ঐ-তিনখানা খতের মধ্যে একখানিতে বুলাকিদাসের ৪৮,০২১৲ টাকা দেনার কথা লিখিত ছিল। মহারাজ নন্দকুমার বলিলেন যে, তাঁহার গচ্ছিত অলঙ্কারের মূল্য বাবদ বুলাকি-দাস তাঁহাকে এই খত দিয়াছিলেন। এই খতখানি ফারসী ভাষায় লিখিত। আমি ফারসী জানি না। তবুও এই খত সত্য নয় বলিয়া আমার খুব সন্দেহ হইল। এই সকল খত, বুলাকিদাসের সম্পত্তির অন্যান্য কাগজপত্র সহ প্রোবেট লইবার সময়, মেয়র কোর্টে দাখিল করা হয়। সেই হইতে খতগুলি বরাবর মেয়র কোর্টেই ছিল; কিন্তু আমি খত-গুলির একখানি করিয়া নকল আমার কাছে রাখি।

"কামালদ্দীন আলি খাঁর নিকট বুলাকিদাসের সম্পত্তির তরফ হইতে কিছু টাকা পাওনা ছিল। মহারাজ নন্দ-কুমারের সহিত হিসাব পরিষ্কার করিবার কয়েকদিন পরে, আমি কামালদ্দীনের কাছে সেই টাকা চাই। কামালদ্দীন আমার বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, মাত্র ছয় শত টাকা

তাহার কাছে পাওনা আছে ; কিন্তু তখন তাহার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল বলিয়া সে ঐ-দেনা পরিশোধ করিতে পারে না। সেই সময়, মহারাজ নন্দকুমার যে তিনখানা খত ফেরৎ দিয়াছিলেন তাহার নকল তাহাকে দেখাই। কামালদ্দীন সেই তিনখানা খতের নকল পাঠ করিয়া ৪৮,০২১৲ টাকার খতখানি আমাকে দেখাইয়া বলিল —'এই খতের সাক্ষীর নামের স্থানে আমার নামের মোহর এবং আমার নাম রহিয়াছে ; কিন্তু আমি এইরূপ কোন খতে কোনও দিন সাক্ষী হই নাই।' তাহার কাছে এই কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইল।

"পাঁচ-ছয় মাস পরে কামালদ্দীন আমার নিকট আবার আসে। তখন সে বলিল—'মহারাজ নন্দকুমার আমার লবণের মহাল ইজারা লইবার সময় জামিন ছিলেন ; কিন্তু এখন তিনি বলেন যে, তাঁহার কথা মত তিনটি কাজ না করিলে তিনি আর জামিন থাকিবেন না। সেই তিনটি কাজের প্রথমটি হইল এই যে, বুলাকিদাসের বিরুদ্ধে তিনি যে ৪৮,০২১৲ টাকার একখানি খত জাল করিয়াছেন, সেই খত প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে সাক্ষী হইতে হইবে। দ্বিতীয় কাজ—লাসিংটন্-সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার

অভিযোগ করিতে হইবে। আর তৃতীয় কাজ—বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধেও ঘুষ খাওয়ার জন্য নালিশ করিতে হইবে।' কিন্তু কামালদ্দীন আলি খাঁর মত লোক এমন অন্যায় এমন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজ কখনও করিতে পারে না, তাই সে উহাতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং তাহার জন্য একজন জামিনের দরকার। সেইজন্য একজন জামিন সংগ্রহ করিয়া দিতে সে আমাকে অনুরোধ করে।

"কামালদ্দীনের এই কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই। ইহার পর কাছারী আদালতে বুলাকি-দাসের কোম্পানীর খতের টাকার জন্য মহারাজ নন্দ-কুমারের নামে নালিশ করি। সেই মোকদ্দমায় নন্দকুমার তাঁহার জবাবে বলেন যে, তিনি বুলাকিদাসের নিকট তিনখানা খতের টাকা পাইতেন, সেই তিনখানা খত কোম্পানীর খতের মূল্য বাবদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাছারী আদালতে আমাদের অভিযোগ ডিশ্‌মিস্‌ হইবার উপক্রম হয়। তখন আমরা সালিশ মানিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু এ-বিষয়ে আর কোন সালিশী হয় নাই।

"এই নূতন সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর মেয়র কোর্টের সমুদয় দলিল-পত্র সুপ্রীম কোর্টেই আসিয়াছে। আমি সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের

ফেরতি খতগুলির মধ্যে ৪৮,০২১৲ টাকার খতখানি ফেরৎ লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দলিল জাল করিবার অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। মহারাজ নন্দকুমারকে তাঁহার গচ্ছিত অলঙ্কারের মূল্য বাবদ বুলাকিদাস কোনও খত দেন নাই, সুতরাং নন্দকুমার এই খত জাল করিয়াছেন ; আমি তাঁহার বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুত করিবার অভিযোগ করিতেছি।"

মহারাজ নন্দকুমার ও ফাউক্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে-কামালদ্দীন আলি খাঁ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল সেই কামালদ্দীনই মোহনপ্রসাদের এই এজাহার সমর্থন করিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। সে বলে —"আমি দেখিয়াছি যে, ৪৮,০২১৲ টাকার খতে আমার নাম ও আমার নামের ছাপ রহিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার আমার নাম জাল করিয়াছেন এবং আমার কাছে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন।"

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ মোহনপ্রসাদের অভিযোগ-পত্র গ্রহণ করিলেন। তখন বুঝিতে পারা গেল যে, এই জাল দলিল প্রস্তুতের অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাবদ্ধ করা হইয়াছে।

১২

কারাগারে নন্দকুমার

৬ই মে শনিবার মহারাজ নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে-সমন বাহির হয় তাহাতে মোহনপ্রসাদ শুধু একজন সাক্ষীই ছিল, সে নিজে সে-দিন ফরিয়াদী হয় নাই। সে-দিন ফরিয়াদী হইয়াছিলেন কোম্পানীর উকীল। ৭ই মে রবিবার মোহনপ্রসাদকে ফরিয়াদী দাঁড় করাইয়া, জাল দলিল প্রস্তুতের অভিযোগ তৈয়ারী করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, গ্রেপ্তার করিবার সময় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করিবার অপরাধ ধার্য্য করা হয় নাই। নন্দকুমারকে জেলে আবদ্ধ করিবার পর তাঁহার বিরুদ্ধে জাল করিবার অপরাধ স্থির হয়। ইহা সমনে লিখিত কথা হইতেই প্রমাণিত হয়। *

---

* সমনে লিখিত ছিল—"Receive into your custody the body of Maharaja Nandakumar, herewith sent you, charged before us upon the oaths of Mohanprasad, Kamaladdin Khan, and others with feloniously uttering," etc.—Beveridge.

যে ঘোর চক্রান্ত করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে অকস্মাৎ কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তাহার মূলে ছিলেন হেষ্টিংস্, বারওয়েল, ভান্সিটার্ট, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং কান্ত পোদ্দার প্রভৃতি। গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার উৎকোচ-গ্রহণ ও নানা অসদাচরণের অভিযোগ আনিয়াছেন, সুতরাং যে-কোন প্রকারেই হোক্ তাঁহাকে শায়েস্তা করিতে হইবে, ইহাই ছিল হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য এবং এই দলিল জালের অভিযোগের মূলে যে প্রধানতঃ তিনিই ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। * আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ ইলাইজা ইম্পে যে হেষ্টিংস্ ও তাঁহার সহচরদের জন্য ন্যায়, ধর্ম্ম, বিবেক, মনুষ্যত্ব—সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মোহনপ্রসাদ দলিল জাল করিবার কথা বহু পূর্ব্বে জানিতে পারা সত্ত্বেও এতদিন চুপ করিয়া

* The ostensible prosecutor was a native; but it was then, and still is, the opinion of every body, idiots and biographers excepted, that Hastings was the real mover in the business.

—Macaulay.

ছিল কেন? আর যতদিন নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই ততদিনই বা নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করিবার দরকার হয় নাই কেন?

মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কারাগারে থাকা তখন অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় ছিল। কারাগারে গেলে পাপ হয়, জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, —ইহাই ছিল সকলের বিশ্বাস। কাজেই কারাগারে নন্দকুমার কিছুতেই আহার করিতে রাজী হইলেন না। তিন-চারিদিন তিনি অনশনেই কাটাইলেন, তিনি স্বতন্ত্র আহারের বন্দোবস্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচার-পতিদের নিকট দরখাস্ত করিলেন।

সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এই অন্যায় আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজদের জানাইলেন—"মহারাজ নন্দকুমার অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তিনি কারাগারে আহার করিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে যদি কারাগারে রাখিতেই হয়, তবে তাঁহার জন্য আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।" কিন্তু এই অনুরোধ সত্ত্বেও ধর্ম্মাবতারগণ তিন-চারিদিনের মধ্যে কোন বন্দোবস্তই করিলেন না।

নন্দকুমারের এই চূড়ান্ত দুর্দ্দশার সময়ে দুইজন

উদারচেতা, স্নেহশীলা ইংরাজ মহিলা জেলখানায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন ও সান্ত্বনা দেন। তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারে তাঁহারাও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন ক্লেভারিং-সাহেবের কন্যা, আর একজন মন্‌সন্‌-সাহেবের সহধর্ম্মিণী।

অনেক পরামর্শের পর বিচারপতিগণ জেলে ব্রাহ্মণের আহার করা সম্বন্ধে মতামত জানিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন পণ্ডিতকে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

এই হুকুম পালন করিবার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন কান্ত পোদ্দার। তিনি তাড়াতাড়ি কয়েকজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের কাছ থেকে সুবিধামত ব্যবস্থা পাওয়া কিছুমাত্র শক্ত হইল না। তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—কারাগারে আহার করিলে পতিত হইবে কেন? বিশেষতঃ রাজপুরুষের হুকুমে কোনও কাজে পাপ হয় না। রাজদণ্ড ভোগের পর সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সব পাপ খণ্ডন হইয়া যায়।

অন্য কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মত গ্রহণ করিবার জন্য নন্দকুমার আবার দরখাস্ত করিলেন। এই সময় একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ মত দিলেন যে, কারাগারে

অন্নগ্রহণ করিলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই রকম মতদ্বৈধ দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিচারপতিগণ নন্দকুমারকে স্বতন্ত্র আহারের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিলেন ; সুতরাং তাঁহার আহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র তাঁবু দেওয়া হইল।

মহারাজ নন্দকুমারের এই শোচনীয় অবস্থায় সকলেরই মনে একটা আঘাত লাগিয়াছিল। প্রত্যহ শত শত লোক কারাগারে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লাগিল। কারা-রুদ্ধ অবস্থায়ও তাঁহার দরবার চলিতে লাগিল।

১৩

নন্দকুমারের চিঠি ও অলঙ্কারের দলিল

৮ই মে সোমবার মহারাজ নন্দকুমার কারাগার হইতে কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট একখানা চিঠি লিখেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—

"নবাব মীর জাফরের সময়ের বাংলাদেশের মন্ত্রী ও ইংরাজদের বিশেষ বন্ধু, দেওয়ানের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পুত্রের পিতা, আজ সাধারণ কারাগার হইতে আপনাদের চিঠি লিখিতেছেন, ইহাতে হয় ত আপনারা বিস্মিত হইবেন। গভর্ণর জেনারেল আমাকে যে-ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহার কথা গত মার্চ্চ মাসে আমি আপনাদের জানাইয়াছি। যেখানে স্বয়ং শাসনকর্ত্তা কাহারও সর্ব্বনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হন, সেখানে সেই ব্যক্তির শত্রুরাও তাহার সর্ব্বনাশ করিবার কোন রকম সুযোগই ব্যর্থ হইতে দেয় না। শাসনকর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের মনস্তুষ্টি করিয়া

নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের কাছে হীনতম চরিত্রের লোক বলিয়া গণ্য ব্যক্তিও তাহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ বা ক্রটি করে না। আমি স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলিয়াছি এবং যাহা ন্যায্য তাহাই করিয়াছি, এই জন্য আমার শক্রদের বিদ্বেষবহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়াছে, আমার অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইয়াছে। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদের সম্মানলাভ যিনি করিয়াছেন তিনি কি দুর্নীতিপরায়ণ ও দুশ্চরিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত কতকগুলি লোকের সম্মুখীন্ হইয়া নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবেন? আমার প্রতি গভর্ণর জেনারেলের ক্রোধের এবং আমার শক্রদিগকে তাঁহার উৎসাহিত করিবার কারণ কাউন্সিলের নিকট আমি পূর্ব্বে যে দরখাস্ত দিয়াছি তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। আমার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে আমি যেন সেই অভিযোগে অভিযুক্ত না হই,ইহা আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। যদি এই মিথ্যা অভিযোগে আমার প্রাণহানি করিবার দরকার হয় তথাপি সাক্ষীর অভাব হইবে না—ইহা আমি ভালরূপই জানি।"

জেলে থাকিয়া ব্রাহ্মণের নিয়ম পালন করাও যে

তাঁহার পক্ষে অসম্ভব তাহাও তিনি এই চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই চিঠি পাইবার পর কাউন্সিলের সভায় মন্‌সন্ প্রস্তাব করিলেন যে, নন্দকুমারের উপর যে-সমন জারি করা হইয়াছে তাহা কাউন্সিলে দেখানো হোক্।

এই প্রস্তাব শুনিয়াই হেষ্টিংস্ বলিয়া উঠিলেন—"আমার এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহাদের ক্ষমতাবলে যাহা করিয়াছেন, কাউন্সিল তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেই আমি আপত্তি করিব।"

নন্দকুমারকে সাধারণ জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা ঐ-সমনে ছিল কি না তাহা জানিবার জন্যই এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। আর তাঁহাকে সাধারণ জেলে রাখিবার কথা উহাতে লিখিত ছিল না বলিয়াই, হেষ্টিংস্ এইরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, কাউন্সিলে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ইহাতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি লেমেইষ্টার ও হাইড্ লিখেন, যদি কাউন্সিলের কোন সভ্য তাঁহাদের নামে মিথ্যা দোষ আরোপ করেন, কিংবা মিথ্যা অপবাদ দেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর ইংলণ্ডের কঠোরতম আইন প্রয়োগ করা হইবে।

৮ই মে নন্দকুমারের চিঠি যখন কাউন্সিলে পাঠ করা হয়, তখন হেষ্টিংস্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহারই দশ দিন পরে তিনি তাঁহার এজেণ্ট গ্র্যাহাম্ ও ম্যাক্লিন্-সাহেবকে লিখেন—'বৃদ্ধ নন্দকুমার জেলে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহার ফাঁসি হইবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত (in a fair way to be hanged)।' তাঁহার বন্ধু ইলাইজা ইম্পে যে এ-কাজ করিবেন তাহা তিনি বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখনও কিন্তু অভিযোগের বিচারই আরম্ভ হয় নাই।

এই অভিযোগের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বনই ছিল অলঙ্কারের বাবদ প্রদত্ত দলিল। বুলাকিদাসের প্রদত্ত এই দলিলে তিনজন সাক্ষী ছিলেন—মহতাব রায়, শীলাবৎ এবং আব্দুল কামাল মহম্মদ। কিন্তু এই অভিযোগের সময় তাঁহারা কেহই জীবিত ছিলেন না। ইহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিকও নয়, কারণ খত লিখিত হওয়ার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু ফরিয়াদী-পক্ষ বলিল যে, শীলাবৎ জীবিত নাই, মহতাব রায় বলিয়া কেহ ছিল না, এবং আব্দুল কামাল মহম্মদই কামালদ্দীন আলি খাঁ। ফরিয়াদী-পক্ষের সমস্ত ব্যাপারটি একটা প্রকাণ্ড রহস্য বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের মনে হইল।

ফ্যারার ও ব্রিক্স্ নামে দুইজন আইনজ্ঞ ইংরাজ মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ফ্যারারই এই মোকদ্দমার প্রধান পরিচালক ছিলেন; কিন্তু তিনি তখনও পাশ করা ব্যারিষ্টার ছিলেন না বলিয়া, ইলাইজা ইম্পের কাছে তাঁহাকে অনেকবার অপদস্থ হইতে হয়।

বিচার আরম্ভ—বাদীপক্ষের কথা

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন বিচার আরম্ভ হইল। সুপ্রীম কোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। মীর জাফরের সময়ের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, নূতন নবাবের দেওয়ানের পিতা, তখনকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুত্বশালী, সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক্, তেজস্বী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে অভিযুক্তের পোষাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইল।

এদিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ লোহিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বিচারাসনে বসিলেন।

গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস্ ও তাঁহার সহচর কান্ত পোদ্দার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি আসিয়া দর্শকবৃন্দের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। আর মিষ্টার ফ্যারার, রাধাচরণ রায়, চৈতন্যনাথ প্রভৃতি নন্দকুমারের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জুরিগণ একে একে শপথ গ্রহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

মিষ্টার ইলিয়ট নামে একজন ইংরাজ যুবককে প্রধান বিচারপতি দো-ভাষী (Interpreter) নিযুক্ত করিলেন। মিষ্টার ফ্যারার ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। ইলিয়টের উপর ফ্যারার ও নন্দকুমার উভয়েরই কিছু-মাত্র আস্থা ছিল না, কারণ তিনি ইম্পের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন এবং ইম্পে তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। ইহা ছাড়া ইলিয়টের সঙ্গে নন্দকুমারের শত্রুদেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিষ্টার ইলিয়টও এই সময়ে দো-ভাষী হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ইহাতে ইম্পে বলিলেন—"মিষ্টার ইলিয়ট, আপনাকেই দো-ভাষী হইতে হইবে। নানা ভাষায় আপনার পারদর্শিতা * এবং আপনার সরলতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আপনার বিরুদ্ধে অপবাদের কোনই ভিত্তি নাই।"

ফ্যারার যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আপত্তি টিকিবে না তখন তিনি বলিলেন—"মিষ্টার ইলিয়ট যেন

* বেভারিজের মতে ইহা সত্য নয়। ইলিয়ট এ-দেশীয় ভাষার মধ্যে কেবলমাত্র ফারসী ও হিন্দুস্থানী কিছু কিছু জানিতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না।

মনে না করেন যে, আমিই তাঁহার দো-ভাষী নিয়োগে আপত্তি করিয়াছি। আমাকে আপত্তি করিতে বলা হইয়াছে।"

ইম্পে। কে আপত্তি করিতে বলিয়াছে ?

ফ্যারার। আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না।

ইম্পে। আপনি যখন তাহার নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না তখন এ-আপত্তি উত্থাপন করাও আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না।

তার পর তিনি জুরীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইলিয়টকে বাদ দিয়া অন্যের দ্বারা এ-কাজ চলিবে কি ?"

জুরীরা বলিলেন—"আমাদের মনে হয় নিশ্চয়ই চলিবে না।"

ইম্পে। মিষ্টার ইলিয়টের চরিত্রের উপর এ বড়ই নির্ম্মম দোষারোপ। তাঁহার কৃতিত্ব, যৌবন, বংশ-মর্য্যাদা প্রভৃতি সত্ত্বেও এইরূপ দোষারোপ করিলে বড়ই অন্যায় হইবে।

জুরিগণ তখন বলিলেন—"মিষ্টার ইলিয়টের চরিত্র ও ক্ষমতা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা মিষ্টার ইলিয়টই অনুগ্রহ করিয়া দো-ভাষী হোন্।"

বলা বাহুল্য জুরিদের এই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইল।

তার পর কথা উঠিল সুপ্রীম কোর্টের এলাকা লইয়া। আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ছিল শুধু কলিকাতা। মহারাজ নন্দকুমার কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন না। তিনি বরাবর মুর্শিদাবাদেই থাকিতেন। বিশেষতঃ এই দলিলের তারিখ ছিল ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট, তখনও নন্দকুমার কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন নাই। সেই বৎসরেরই শেষ ভাগে লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে দেওয়ানী দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার প্রতি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। সুতরাং নন্দকুমারকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় থাকিতে হয়—কিন্তু এ-আপত্তিও টিকিল না।

এইবার বিচার আরম্ভ হইল।

ইংলণ্ডেশ্বর বনাব মহারাজ নন্দকুমার

উপস্থিত—সার্ ইলাইজা ইম্পে—প্রধান বিচারপতি

রবার্ট চেম্বার্স

লেমেইষ্টার

জোহান হাইড্

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একে একে কুড়িটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইল—জাল দলিল প্রস্তুত

করা, জাল দলিল ব্যবহার করা, জাল দলিল প্রকাশ করা, জাল দলিল অন্যের হস্তে অর্পণ করা, জাল দলিল স্পর্শ করা, দর্শন করা ইত্যাদি। অভিযোগগুলি একে একে তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো হইল।

নন্দকুমার বলিলেন—"আমি নির্দোষ।"

বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কাহার দ্বারা বিচার প্রার্থনা করেন?"

নন্দকুমার বলিলেন—"আমি প্রার্থনা করি আমার বিচার করুন ভগবান এবং আমার দেশীয় আমার সমশ্রেণীর লোক।"

নন্দকুমারের নিবেদন অগ্রাহ্য হইল। ইংরাজ ইউরেশিয়ান প্রভৃতি হইতে বার জন জুরী মনোনীত হইলেন। এই জুরীদের অনেকের সঙ্গেই নন্দকুমারের অসদ্ভাব ছিল, সুতরাং তাঁহারা এইবার শত্রুতা-সাধনের উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইলেন। হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের অসদ্ভাবই এই শত্রুতার অন্যতম কারণ। যাহাতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, এই জন্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই জুরী মনোনীত করা হইল।

জুরীদের মধ্যে দুইজনের সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানিতে পারা যায়, বাকী সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল। এই

দুইজনের একজন রবিন্সন। ইনিই ছিলেন জুরীদের মুখ-পাত্র (foreman)। আর একজন ওয়েষ্টন্। এই রবিন্সন মিষ্টার ফ্যারারের নিকট যে-সকল পত্রাদি লিখেন, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। কিন্তু ওয়েষ্টনের যোগ্যতা ছিল আরও বেশী, কারণ তিনি ছিলেন হল্‌ওয়েল-সাহেবের চাকর—জাতিতে ইউরেশিয়ান। জুরিদের অনেকেই এই রকম যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। এই দ্বাদশ রত্নের সমাবেশের জন্য যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি খরচ করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই সম্পর্কে আরও একটি ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিচার হইবার পূর্ব্বেই, নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও, প্রধান বিচারপতি ইম্পে কোন্ বিশেষ আইনানুযায়ী নন্দকুমারের বিচার হইবে সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্ক না শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই যে-বিচারক এরূপ স্থির মতামত পোষণ ও প্রকাশ করেন তিনি যে বিচারপতি হইবার একান্ত অযোগ্য তাহা বলাই বাহুল্য। হাইড্ ও লেমেইষ্টারও পূর্ব্ব হইতেই নন্দকুমারের

অপরাধ ও তাহার শাস্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হন। লেমেইষ্টার ত বিচারের প্রায় একমাস পূর্ব্বে প্রকাশ্য ভাবেই মত ব্যক্ত করেন যে, এলাকার (jurisdiction) প্রশ্নে না বাধিলে বিচারে নন্দকুমার নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত হইবেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে একটি বিশেষ আইন শুধু একটি বিশিষ্ট ব্যাপারের জন্যই প্রচলিত ছিল। ব্যাঙ্কের নোট্ বা চেক ভয়ঙ্কর জাল হইত বলিয়া জাল-অপরাধে চরম দণ্ড হইতে পারিত। কিন্তু ইংলণ্ডের বাহিরে, এমন কি স্কটল্যাণ্ডেও সে-আইনের ব্যবহার ছিল না। কলিকাতায় নন্দকুমারের বিচারে সেই আইন প্রয়োগ করিবার কথাই প্রধান বিচারপতি প্রকাশ করেন। বিচারপতি চেম্বার্স ইহাতে ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিজেদের দলে টানিয়া আনিতে ইম্পেকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সুতরাং ইংলণ্ডের আইনই কলিকাতায় প্রযোজ্য বলিয়া স্থির হইল।

এইবার সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। প্রথম সাক্ষী, ফরিয়াদী মোহনপ্রসাদ, এজাহারে যে-সকল কথা বলিয়াছিল তাহাই বলিল।

বুলাকিদাস যখন বারাণসী যান, তখন মোহনপ্রসাদ ও পদ্মমোহনকে যে-আমমোক্তারনামা তিনি দেন, সেই

আমমোক্তারনামায় তাঁহার দেনা-পাওনার একটি তালিকা ছিল। তাঁহার কাছে নন্দকুমার ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা পাইবেন বলিয়া তাহাতে উল্লেখ ছিল; ৪৮,০২১৲ টাকার খতের কথার উল্লেখ ইহাতে ছিল না। সুতরাং ঐ-খত জাল বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মোহনপ্রসাদ ইহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিল। কিন্তু ইহাতে যেমন নন্দকুমারের ৪৮,০২১৲ টাকার খতের উল্লেখ ছিল না, তেমনি কোম্পানীর কাছে বুলাকিদাসের প্রাপ্য টাকারও ইহাতে কোন উল্লেখ ছিল না। কাজেই তালিকা যে অসম্পূর্ণ ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। উপরন্তু বুলাকিদাসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার হিসাবরক্ষক কৃষ্ণ-জীবন আন্দাজে এই তালিকা প্রস্তুত করে, তাহাও আবার ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাব দৃষ্টেই এই তালিকা তৈরী হয়। এই জন্যই উহাতে কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য টাকার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণজীবনের কথা হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়। তথাকথিত জাল দলিলের তারিখ ছিল ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট। কৃষ্ণজীবনের প্রমাণ হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ-হিসাবের তালিকায় নন্দকুমারের প্রাপ্য ৪৮,০২১৲ টাকার উল্লেখ নাই বলিয়াই দলিল জাল নয়।

দ্বিতীয় সাক্ষী, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার বাদী কামালদ্দীন আলি খাঁ, শপথ গ্রহণ করিয়া বলিল—"আমার নাম কামালদ্দীন আলি খাঁ। নবাব মীর জাফরের আমলে কিছুদিন কারাবদ্ধ থাকিবার পর মুক্তিলাভ করিয়া আমি নবাবের কাছে একখানা দরখাস্ত করি। তখন মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান। নন্দকুমার আমাকে আমার নামের মোহর মুদ্রিত করিয়া দরখাস্ত পাঠাইতে লিখেন। দরখাস্তে আমার নামের মোহর মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আমি আমার মোহরটি তাঁহার কাছে পাঠাই। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু মোহরটি তাঁহার কাছেই রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও তিনি আমাকে সে-মোহর ফেরৎ পাঠান নাই।"

যে-দলিল জাল করিবার অপরাধে নন্দকুমার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই দলিলখানি কামালদ্দীনকে দেখান হইল এবং তাহাতে তাহার নামের মোহর আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইল। কামালদ্দীন বলিল—"হাঁ ধর্ম্মাবতার, এই দলিলে যে-মোহরের ছাপ রহিয়াছে তাহা আমারই নামের মোহর। এই মোহরই আমি চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের কাছে পাঠাইয়াছিলাম। আমার চাকর হোসেন আলি ইহার সাক্ষী। এ-কথা আমি

খ্বাজা পেক্রজ্ ও মুন্সী সদরদ্দীনকে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

সার্ ইলাইজা ইম্পে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দলিলের মোহর তোমারই নামের মোহর বলিয়া বলিতেছ। তোমার নাম কামালদ্দীন আলি খাঁ, কিন্তু দলিলে আব্দুল কামাল মহম্মদ রহিয়াছে কেন ?"

কামালদ্দীন। আমার নাম পূর্ব্বে আব্দুল কামাল মহম্মদ ছিল বটে—কিন্তু নবাব নজমদ্দৌলার সময়ে, মহম্মদ রেজা খাঁয়ের নায়েব-সুবাদার হইবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে, আমি ঐ-নামের পরিবর্ত্তে কামালদ্দীন আলি খাঁ নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি।

'কামালদ্দীন' কথার অর্থ ধর্ম্মে পূর্ণতা লাভ। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, আব্দুল কামাল মহম্মদই এই খেতাব লাভ করিয়া কামালদ্দীন আলি খাঁ হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহার এ-কথা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কারণ, নজমদ্দৌলা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করেন এবং নবাব হইয়াই তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে তাঁহার নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। সুতরাং কামালদ্দীন যদি যথার্থই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তবে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম

আগেই অর্থাৎ এই দলিল প্রস্তুত হইবার সাত-আট মাস পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব যে, নাম পরিবর্ত্তনের দীর্ঘদিন পরেও মহারাজ নন্দকুমার কামালদ্দীনের প্রচলিত এবং প্রকৃত নাম না লিখিয়া, তাহার প্রাচীন নাম লিখিবেন এবং প্রাচীন নামের মোহর অঙ্কিত করিবেন।

বিচারপতি হাইড্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দলিলে যে তোমারই নামের মোহর দেওয়া হইয়াছে এবং সাক্ষীর নামের জায়গায় যে তোমারই নাম লেখা হইয়াছে তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে?"

কামালদ্দীন। স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমারই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দলিলে সাক্ষীর স্থানে তিনি আমার নামের মোহর অঙ্কিত করিয়াছেন এবং আমার নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে এই দলিল সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সাক্ষ্য দিতেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হই নাই।

ইহার পর কামালদ্দীন এক জাল চিঠি দাখিল করিয়া বলে যে, তাহার নামের দস্তখৎ ও মোহর পাইয়া মহারাজ নন্দকুমার তাহাকে ঐ-চিঠি লিখেন। কিন্তু এই পত্রে আসল কথার, সেই নামের মোহরের কথার, কোনই উল্লেখ ছিল না।

কামালদ্দীনের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তৃতীয় সাক্ষী, তাহার ভৃত্য হোসেন আলি মিঞা, উপস্থিত হইল। শপথ গ্রহণ করিয়া সে বলিল—"আমার নাম হোসেন আলি। আমি কামালদ্দীন আলি খাঁর চাকর। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তিনি যখন নালিশ করেন, সেই সময় হইতে আমি আমার মনীবের এখানেই আছি। নন্দকুমারকে তিনি যে তাঁহার নামের মোহর পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি জানি। কারণ, মোহরটি একটি থলিতে করিয়া পাঠান হয়, আর আমিই সেই থলিটি সেলাই করি।

চতুর্থ সাক্ষী, খ্বাজা পেক্রজ্, শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আর্ম্মেনিয়ান এবং কামালদ্দীনকে বিশেষ রকম চিনেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে কামালদ্দীন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার নামের মোহর মহারাজ নন্দকুমারের কাছে আছে।

খ্বাজা পেক্রজ্ হেষ্টিংসের একজন পুরাতন বন্ধু। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া হেষ্টিংস্ দেশে ফিরেন। তাঁহার ভ্রাতা মীর কাশিমের সেনাপতি ছিলেন। ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের অনুরোধে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদের

যুদ্ধের সময় নবাবপক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের পক্ষে যোগ দিবার জন্য লিখেন। মীর কাশিমের ঘোর সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার আদেশে এই সেনাপতি নিহত হন।

তার পর উপস্থিত করা হইল, পঞ্চম সাক্ষী মুন্সী সদরুদ্দীনকে। তিনি পূর্ব্বে দীর্ঘদিন নন্দকুমারের পুরাতন শত্রু গ্রেহাম-সাহেবের মুন্সী ছিলেন। গ্রেহাম-সাহেব চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে হেষ্টিংসের বন্ধু বার্ওয়েল-সাহেবের কাছে দিয়া যান। ক্লেভারিং-সাহেবের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সদরুদ্দীন ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িত ছিলেন।

শপথ গ্রহণ করিয়া সদরুদ্দীন বলিলেন—"কামালদ্দীন আমার কাছে বলিয়াছিল যে, মহারাজ নন্দকুমার একখানা জাল দলিলে তাহার নামের মোহর মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নাম লিখিয়াছেন এবং ঐ-দলিল সত্য বলিয়া প্রমাণ দিবার জন্য তাহাকে বলিয়াছেন। লবণের মহাল ইজারার জামিন হইবার জন্য কামালদ্দীন নন্দকুমারকে অনুরোধ করে; কিন্তু নন্দকুমার বলেন যে, তাঁহার পক্ষ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে তিনি কামালদ্দীনের জামিন হইতে পারিবেন না। আমি কামালদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার নামের

মোহর নন্দকুমারের কাছে গেল কি রকমে ?' তাহাতে কামালদ্দীন বলে যে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে একখানা দরখাস্তে ছাপ দেওয়ার জন্য তাহার নামের মোহর নন্দকুমারের কাছে পাঠাইয়াছিল ; কিন্তু তাহা আর ফেরৎ পায় নাই।"

ষষ্ঠ সাক্ষী, সহবৎ পাঠক নামে এক ব্রাহ্মণ, শপথ করিয়া বলিল—"আমি শীলাবতের চাকর ছিলাম। আমি তাঁহার হাতের লেখা চিনি। দলিলের এই দস্তখত তাঁহার নিজের নয়, তাঁহার লেখা এত ভাল ছিল না।"

সহবৎ পাঠকের জবানবন্দীতে এমন অনেক কথা আছে যাহা পরস্পর-বিরোধী। সে একবার বলে যে, সে নয় বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম দিল্লী ছাড়িয়া আসে—আবার বলে যে, সে বক্সারের যুদ্ধে গিয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধ হয় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ এই মোকদ্দমার এগারো বৎসর পূর্ব্বে। তাহার অন্যান্য কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সে কলিকাতায় শীলাবতের সঙ্গে ছিল না এবং শীলাবতের হস্তাক্ষরের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগও তাহার ঘটে নাই।

ইহার পর সপ্তম সাক্ষী মুন্সী নবকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন। এই মুন্সী নবকৃষ্ণই রাজা নবকৃষ্ণ দেব। নবকৃষ্ণ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের মুন্সী ছিলেন। তার পর তিনি ক্লাইবের মুন্সী ও পরে তাঁহার বেনিয়ান হন। তাঁহার সঙ্গে নন্দকুমারের শত্রুতার একটি বিশেষ কারণও ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র এমনই উন্নত ছিল যে, তিনি একজন ব্রাহ্মণ বিধবার উপর বলাৎকার করিয়াছেন বলিয়া মহারাজ নন্দকুমার কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পুরুষপ্রবর আবার সাত-সাতটি বিবাহও করিয়াছিলেন। এইবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া নন্দকুমারের উপর প্রতিশোধ লইবার তিনি উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইলেন।

শপথ গ্রহণ করিয়া নবকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার নাম নবকৃষ্ণ দেব। আমি বহুদিন ক্লাইবের মুন্সী ছিলাম। মৃত বুলাকিদাসের পক্ষ হইতে শীলাবৎ আমার সঙ্গে যে-সকল চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করিতেন তাহা হইতেই তাঁহার হাতের লেখা আমি চিনি।"

সার্ ইলাইজা ইম্পে দলিলখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন,—"ইহাতে শীলাবতের দস্তখৎ আছে কি?"

"হাঁ, আছে—এই যে শীলাবতের নাম।"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ নবকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়া দিলেন।

ইম্পে। আপনি কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, এই দস্তখৎ শীলাবতের নিজের নয়?

নবকৃষ্ণ। লর্ড ক্লাইব ও আমার কাছে শীলাবৎ অনেক চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া আমার সম্মুখেও তিনি অনেক সময় লিখিয়াছেন। এ-লেখা তাঁহার লেখার মত নয়, তাঁহার লেখা এত ভাল ছিল না। তবে ভগবান জানেন এ-লেখা তাঁহার কি না।

নবকৃষ্ণের এই কথাটিই বড় সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইল। বিচারপতিরা বড়ই ফ্যাসাদে পড়িলেন। দলিল যে জাল তাহা ত ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় না।

বাদী মোহনপ্রসাদকে আবার ডাকা হইল। সে আবার উপস্থিত হইল। এজেহার দেওয়ার সময়ে সে একটা কথা বলিয়াছিল যে, ৪৮,০২১৲ টাকার দলিলখানি সত্য বলিয়া পদ্মমোহন তাহাকে বলিয়াছিল। একবার দুইবার করিয়া তাহাকে নয়বার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইল, কিন্তু এ-কথা কিছুতেই অপ্রমাণ করা গেল না। পূর্ব্বেও সে যাহা বলিয়াছিল শেষেও তাহাই বলিল।

ধর্ম্মাবতারগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এত চেষ্টা করিয়াও, ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও নন্দকুমারের

অপরাধ সপ্রমাণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। কাজেই এক এক জন সাক্ষীকে বারে বারে উপস্থিত করিয়া নানা রকমের প্রশ্ন করা হইতে লাগিল। মূল দলিল যে জাল তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না।

দলিলে শীলাবতের দস্তখৎ প্রকারান্তরে জাল বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে নবকৃষ্ণের বরাৎ ভালরূপই খুলিয়া গেল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ কলিকাতার উপরই তাঁহাকে একটি প্রকাণ্ড তালুক দেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ধার করেন। রাজা নবকৃষ্ণ অবশ্য এই টাকা আর আদায় করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই টাকার দাবী করিয়া বিলাতের আদালতে নালিশ করেন। হেষ্টিংস্ দেনা অস্বীকার না করিলেও নবকৃষ্ণের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়।

১৫

বিচার—প্রতিবাদীপক্ষের কথা

বিচারকগণ প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী উপস্থিত করিবার জন্য মিষ্টার ফ্যারারকে আদেশ দিলেন।

ফ্যারার বলিলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুতের অপরাধ একেবারেই প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আসামী ইহাতেই খালাস পাইতে পারেন।

বাদী মোহনপ্রসাদকে ফ্যারার-সাহেব জেরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দলিলে তুমি এমন কি দেখিয়াছিলে যাহাতে তোমার সন্দেহ হইয়াছিল?" উত্তরে সে বলিয়াছিল—"ইহাতে বুলাকিদাসের নামসহি ছিল না, এবং আমি জানিতাম যে, শীলাবৎ দেড় বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন।" কাজেই দেখা যাইতেছে, দলিলে যে-নামের মোহরের ছাপ ছিল তাহা খাঁটি, তাহা জাল নয়; কারণ মোহনপ্রসাদের শুধু সন্দেহ বা আপত্তি এই ছিল যে,

দলিলে বুলাকিদাসের স্বাক্ষর ছিল না। নামের মোহর কিম্বা ছাপ যে জাল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, আর মূল দলিলটিও যে জাল তাহাও কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় নাই। দলিলে শুধু বুলাকিদাসের সহি ছিল না বলিয়াই মোহনপ্রসাদ উহাকে জাল বলিয়া অভিযোগ করিতে গিয়াছিল।—কিন্তু বিচারকরা এ-সব যুক্তি একেবারেই গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা ফ্যারারকে বলিলেন, "আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অতএব আপনাকে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে —নতুবা জুরীদের কাছে আমরা আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণের আলোচনা করিব।"

অনন্যোপায় হইয়া ফ্যারার এ-আদেশ মানিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষেও অনেক সাক্ষী উপস্থিত ছিল। তাহাদের উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মিষ্টার ফ্যারার বলিলেন, "বুলাকিদাস যখন এই দলিল রচনা করেন, তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের আমি উপস্থিত করিব। তাহা ছাড়া, মোহনপ্রসাদ যখন বুলাকিদাসের এই খত দেওয়ার কথা জানিতে পায় তখন এই খতের সাক্ষী মহতাব রায় এবং আব্দুল কামাল মহম্মদ জীবিত ছিল,

ইহাও প্রমাণিত হইবে। বুলাকিদাসের লিখিত চিঠি-পত্র আমি দেখাইব, তাহাতে তিনি অলঙ্কার ও দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। আর গঙ্গাবিষ্ণুর সমক্ষে মোহন-প্রসাদ ও পদ্মমোহন দাসের স্বাক্ষরিত একটি হিসাব দাখিল করিব, তাহাতে এই দলিলের টাকার উল্লেখ আছে। বুলাকিদাসের সহিত মহারাজ নন্দকুমারের যে-সকল চিঠিপত্রের বিনিময় হইয়াছিল তাহাতে এবং বুলাকিদাসের নিজের হাতের লেখা একখানা কাগজেও এ-বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।"

এবার একে একে সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

প্রথম সাক্ষী তেজ রায়। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, বাড়ী চুঁচুড়া। ইনি দলিলের সাক্ষী মহতাব রায়ের ছোট ভাই। মহতাব রায়ের নামের মোহরের ছাপ দেওয়া একখানি চিঠি হইতে তিনি দলিলের মোহরের সত্যতা প্রমাণ করেন। এই মোহরের সঙ্গে দলিলের মোহরের মিল হয়।

তার পর হাজারী মল ও কাশীনাথ নামে দুইজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। কে যে তাহাদের উপস্থিত করিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। খুব সম্ভব বিচার-পতিগণ নিজেরাই তাহাদের তলব করিয়াছিলেন।

তাহাদের সাক্ষ্য লওয়ার জন্য তেজ রায়ের জবানবন্দী বন্ধ করা হয় এবং তাহারা ফরিয়াদী-পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। নন্দকুমারের পক্ষের সাক্ষী তাহারা নহে,—তাহা হইলে তাহারা নন্দকুমারের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিবে কেন? যাহা হোক্, তাহাদের উক্তি পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে। তাহারা যে হেষ্টিংসের অনুগত ও তাহার দলের লোক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কারণ, হাজারী মলকে অংশীদার করিয়া হেষ্টিংস্ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীনাথ ছিল মিষ্টার রাসেল নামক একজন সাহেবের বেনিয়ান। মোকদ্দমার শুনানী শেষ হইলে ইম্পে জুরীদের যে-অভিভাষণ দেন তাহাতেও এই দুই সাক্ষীর উল্লেখ নাই। সর্ব্বোপরি ইম্পেকে এই বিচারের জন্য হেষ্টিংসের অনুগত লোকগণ যে-অভিনন্দনপত্র দিয়াছিল তাহাতে হাজারী মলেরও স্বাক্ষর ছিল।

পরের সাক্ষী রূপনারায়ণ চৌধুরীর জবানবন্দীতে প্রথম সাক্ষী তেজ রায়ের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। রূপনারায়ণ চৌধুরী খুব সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানের রাণীর পেশকার ছিলেন এবং কলিকাতার কাউন্সিল কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানের রাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জয়দেব চোবে, চৈতন্যনাথ, লালা ডোমন সিং এবং ইয়ার মহম্মদ—এই চারিজন সাক্ষী দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। ফরিয়াদী-পক্ষের অত্যন্ত কঠোর জেরাতেও তাহাদের কথার পরিবর্তন হয় নাই। দলিল লেখা, মোহরের ছাপ দেওয়া এবং মহম্মদ কামালের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহারা সকলে একই রূপ কথা বলে। আব্দুল কামাল মহম্মদ যে মারা গিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ জয়দেব চোবে ও ইয়ার মহম্মদ দেয়।

বুলাকিদাসের নামের মোহরের ছাপ সপ্রমাণ করিবার জন্য লালা ডোমন সিং তিনখানা চিঠির খামের উপরের মোহরের ছাপ দেখাইল। চিঠিতে বুলাকিদাস যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য চিঠি খোলা হইলে এবং চিঠি দ্বারা দলিলের সত্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে, বিচারপতিগণ তাহাতে বুলাকিদাসের স্বাক্ষর নাই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। সে-সময়ের প্রচলিত ফারসী রীতি অনুসারে স্বাক্ষর না করিয়া শুধু নামের মোহরের ছাপ দিয়াই চিঠি লেখা চলিত, এমন কি দলিলাদিতে পর্য্যন্ত শুধু নামের মোহর ব্যবহৃত হইত। সমকক্ষ লোকের কাছে চিঠি লিখিতে সাধারণতঃ খামের উপর, আর পদমর্য্যাদায় খাটো লোকের কাছে চিঠির

নীচে নামের মোহরের ছাপ দেওয়া হইত, নাম স্বাক্ষর করিবার কোনই দরকার ছিল না। এ-অবস্থায় লালা ডোমন সিং-এর চিঠি তিনখানি যথেষ্ট কারণ ব্যতীতই অগ্রাহ্য করা হইল বলিতে হইবে।

এই সময়ে জুরীরা চিঠিগুলি দেখিতে চাহিলেন। প্রধান জুরী রবিন্সন্ চিঠিগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—চিঠিগুলিকে অতি অল্পদিনের লেখা বলিয়া মনে হইতেছে—প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিয়া জুরীদের ইহার সত্যতায় বিশ্বাস করিতে বলিলে প্রকারান্তরে তাঁহাদের নির্ব্বোধই বলা হয়—তাঁহাদের অপমান করা হয়।

জুরী-প্রধানের এইরূপ উক্তিতে এ-দেশীয় দলিলাদি সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইল এবং তিনি যে নিতান্ত অবিবেচক ও হঠবুদ্ধি তাহাই ফ্যারার প্রভৃতি সকলে বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে এবং বিচার-পতিগণের পক্ষপাতিতায় ফ্যারারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।*

---

* বেভারিজ-সাহেব বলেন—"I do not wonder at Farrer's losing his temper. The jury's remark was most ignorant and reckless, as an inspection of the jewels-bond and the other Persian papers at the trial will show."

তিনি উত্তেজিতভাবে জুরীদের দুই-চারি কথা বলিতেই প্রধান বিচারপতি ইম্পে তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং জুরীদের সঙ্গে এরূপভাবে কথা বলা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিলেন।

যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, বিচারকগণ ফার্সীভাষায় তৎকাল-প্রচলিত চিঠিলিখন-প্রণালী অনবগত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের এ-অজ্ঞতা মার্জ্জনীয় নয়। দলিল যে জাল নয় তাহা এই চিঠিগুলি হইতেই সপ্রমাণ হয়। যাহা হোক, চিঠিগুলি জোর করিয়া অগ্রাহ্য করায় নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ সাধন সহজসাধ্য হইল।

নন্দকুমার আসামী, তখনকার বিচার-পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কোন কথা কহিবার উপায় ছিল না। এই ব্যাপারের পর তিনি ফ্যারারকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি বিচারকেরা আমার শত্রু; আর সাক্ষী উপস্থিত করা, প্রমাণ দেওয়া বৃথা; আমার সাক্ষীদের সঙ্গে যে-রকম অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে আর কিছুই করিবার দরকার নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।" ফ্যারারও বুঝিলেন কথাটা খুবই ঠিক, তাই তিনি এ-কথার কোন জবাবই দিতে

পারিলেন না। ফ্যারার যখনই কোন কথা লইয়া বিচারকদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়াছেন তখন হইতেই তাঁহার সাক্ষীদের প্রতি অধিকতর অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ফরিয়াদী-পক্ষের অর্থাৎ সরকার-পক্ষের সাক্ষীদের প্রতি কঠোর ভাব দেখান ত দূরের কথা, তাহাদের ভাল করিয়া জেরাই করা হয় নাই বা করিতে দেওয়া হয় নাই। একজন বিচারপতি (চেম্বার্স) পর্য্যন্ত ইহার যথার্থতা স্বীকার করিয়াছেন।

প্রমাণ স্বরূপ কামালদ্দীন আলি খাঁর সাক্ষ্যের কথাই বলা যায়। তাহার নামের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাহাকে ভালরূপ জেরা করা হয় নাই। সে যদি নবাবের নিকট হইতেই খেতাব পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সনদ গেল কোথায়? তাহাকে ঐ-সনদ দেখাইতে বাধ্য করা হইল না কেন? কেবলমাত্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল? বিচারপতিগণের কি উচিত ছিল না যে, অন্ততঃ তাহাকে ও মোহনপ্রসাদকে নিরপেক্ষ ভাবে জেরা করিয়া সকল রহস্য উদ্ঘাটন করেন? ফলতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বাপর অধিকাংশ ব্যবহারই—অধিকাংশ কাজই নন্দকুমারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচায়ক।

নন্দকুমারের পক্ষে একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন মীর

আসাদ আলি। তিনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের একখানি রসিদ দেখান। এই রসিদে বুলাকিদাসের নামের মোহরের ছাপ ছিল। বক্সারের যুদ্ধের পূর্ব্বে বুলাকিদাস মীর কাশিমের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে রোটাস্‌গড় দুর্গ হইতে মীর আসাদ আলির মারফতে কতক টাকা পাঠান হয়। আসাদ আলি সেই টাকা মীর কাশিমের কাছে লইয়া যান। মীর কাশিম ঐ-টাকা লইয়া তাঁহাকে বুলাকিদাসের কাছে যাইতে বলেন। এই টাকা পাইয়া বুলাকিদাস তাঁহাকে রসিদ দেন।

এই টাকাটা অবশ্য মীর কাশিমের। বুলাকিদাস তাঁহার পক্ষ হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রসিদে 'গোলাম কর্ত্তৃক গৃহীত' লিখিয়াছিলেন। এই রসিদ খুব দরকারী মনে করিয়া মীর আসাদ ইহা ভাঁজ করিয়া, সূতা দিয়া জড়াইয়া, একটি কবচে পূরিয়া নিজের বাহুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তাহা কবচ হইতে বাহির করিয়া, বিচারপতিদের সামনেই সূতা কাটিয়া বহুদিনের ভাঁজ করা সেই ছোট রসিদখানি বাহির করা হইল।

মীর আসাদ পদস্থ লোক ছিলেন। বক্সার-যুদ্ধ-বিজয়ী মেজর মুনরোর কাছ থেকে তিনি দুই হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। তার পর তিনি পাটনা টাকশালের দারোগা

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) হন। বিচারপতিরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই রসিদ মীর কাশিমকে দাও নাই কেন?"

মীর আসাদ উত্তর করিলেন—"তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, মীর কাশিমের পরিজনবর্গ কে কোথায় রহিয়াছে তাহার কিছুই স্থির নাই—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। তিনি আমাকে রোটাস্‌গড় দুর্গে পাঠাইয়াছিলেন। এ-দিকে তিনি নিজেই পলাতক হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। এই জন্য তাঁহাকে রসিদ দেওয়া হয় নাই।"

এই রসিদে অঙ্কিত বুলাকিদাসের মোহরের ছাপ ইম্পে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন যে, দলিলের ছাপ আর রসিদের ছাপ একই মোহরের। তিনি ইহা স্বীকারও করিতে বাধ্য হইলেন—সুতরাং দলিলে অঙ্কিত মোহর যে প্রকৃত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকিল না। তথাপি তিনি এই রসিদ অবিশ্বাস করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমারের অন্য সাক্ষীদেরও অবিশ্বাস করিলেন।

এই রসিদের সত্যতা সম্বন্ধে মীর আসাদ একজন সাক্ষী দিতে চাহিলেন, কিন্তু বিচারপতিরা সে-অনুমতি দিলেন না। পরন্তু তাঁহার জবানবন্দী মিথ্যা প্রমাণ

করিবার জন্য পাঁচ পাঁচ জন ইংরাজকে আনিয়া হাজির করা হইল। ইহাদের মধ্যে একজন কর্ণেল, একজন মেজর ও একজন কাপ্তেন ছিলেন। এইরকম ভাবে যখনই কোন সাক্ষী নন্দকুমারকে সমর্থন করিয়া কিছু বলিতে লাগিল তখনই উল্টা সাক্ষী আনিয়া হাজির করা হইতে লাগিল, কিন্তু আসামী-পক্ষকে ঐরূপ কোন সুবিধা দেওয়া হইল না।

মোহনদাস নন্দকুমারের একজন সাক্ষী। মোহনদাস যেমন বলিল যে, সে একজন ব্যবসাদার, অমনি তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য যুগল নামে একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করা হইল।

নন্দকুমারের আর একজন সাক্ষী মনোহর মিত্র বলিল, "নন্দকুমারের গ্রেপ্তারের তিন দিন পূর্বে মোহনপ্রসাদ আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। আমি যাই, সে একখানি দলিল আমাকে দেখায়। সেই দলিলে অলঙ্কারের কথা লেখা ছিল। দলিলখানি আমার হাতের লেখা, সে আমাকে এইরূপ বলিতে বলে। সে আমাকে দুইটি টিপও দেখায়। সে বলে, যদি আমি দলিলখানি আমারই হাতের লেখা বলি তাহা হইলে মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবেন এবং তাঁহার ভয়ানক শাস্তি হইবে। এই

জন্য আমাকে পাঁচ হাজার টাকাও সে দিতে চাহিয়াছিল। আমি অস্বীকার করিলে সে বলিল, যদি 'তুমি নিজে না পার তবে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির কর যে বলিবে, দলিল তাহারই হাতের লেখা। ইহাতে যত টাকা লাগে আমি দিব, তোমাকেও খুনী করিব। এ-রকম একজন লোক চাই-ই চাই।' আমি বলিলাম, এমন ভীষণ কাজ আমি করিতে পারিব না।—বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।"

মনোহর মিত্রের জবানবন্দী মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য কারাধ্যক্ষ ইয়েগেল্ ও ফরিয়াদী-পক্ষের কৌঁসিলি স্বয়ং ডারহাম্-সাহেবকে উপস্থিত করা হইল।

নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যদি এ-রকম ভাবে অপর পক্ষের সাক্ষী হাজির করিয়া নন্দকুমারের অনুকূল সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে দেওয়া ন্যায়-সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে ফরিয়াদী-পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ইহা না হইতে দেওয়ার কারণ কি?

কৃষ্ণজীবন মোহনপ্রসাদের নিতান্ত হাতের লোক, তথাপি তাহাকে উভয় পক্ষ হইতেই সাক্ষী মান্য করা হয়। মোহনপ্রসাদের ভয়ে ভয়ে সাক্ষ্য দিলেও তাহার সাক্ষ্যে নন্দকুমারের অনুকূলেও অনেক কথা প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণজীবন তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, বুলাকিদাস ফার্সী-ভাষায় লিখিত দলিল-পত্রে তাঁহার নামের মোহরের ছাপ দিতেন; কিন্তু নাগরীভাষায় লিখিত কাগজাদিতে নাম সহি করিতেন। মীর কাশিমের সিপাহীদের বেতন তাঁহার হাত দিয়াই বিতরিত হইত। তিনি সিপাহীদের নিকট হইতে বেতনের হুকুমনামা গ্রহণ করিয়া ফার্সী-ভাষায় লিখিত এক এক খণ্ড কাগজ দিতেন; তাহাতে তিনি নাম সহি করিতেন না, শুধু নামের মোহরের ছাপ দিতেন। কিন্তু কৃষ্ণজীবনের এ-কথা বিচারপতিরা বিশ্বাস করিলেন না।

মনোহর মিত্রের কথা অস্বীকার করিয়া মোহনপ্রসাদ অবশ্য বলে যে, নন্দকুমারের গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে সপ্তাহকাল মধ্যে মনোহরের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই, এবং সে কখনও মনোহরকে ঐ-দলিল দেখায় নাই, তবে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সে ঐ-দলিলের নকল তাহাকে দেখাইয়াছিল বটে। কিন্তু কৃষ্ণজীবন বলে যে, নন্দকুমারের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পূর্ব্বে সে মনোহরকে মোহনপ্রসাদের বাড়ীতে দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার নন্দকুমারের অনুকূল অন্যান্য কথার ন্যায় এ-কথাও বিশ্বাস করা হইল না। অথচ সরকার-পক্ষের অনুকূল যে-সকল কথা বলিতে সে ভয়ে

ঝ

ভয়ে বাধ্য হইয়াছে তাহা বিচারপতিরা নির্ব্বিবাদে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন।

মোহনপ্রসাদের নিজের কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনোহরকে সে ঐ-দলিল দেখাইয়াছিল। উহাই আসল দলিল, কিন্তু দলিলটি কাহার লেখা ঠিক করিতে না পারায় মনোহরকেই উহার লেখক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

রামনাথ দাস নামে ফরিয়াদী-পক্ষের একজন সাক্ষী ছিল ; কিন্তু বিচারের সময় সরকার-পক্ষ হইতে তাহাকে উপস্থিত করা হয় নাই। আসামী-পক্ষ হইতে তলব করিলে সে বলে, "মহারাজ নন্দকুমারের গ্রেপ্তারের দশ-বারো দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে একটি সংবাদ লইয়া আমি মোহনপ্রসাদের কাছে যাই এবং মোহন-প্রসাদকে বলি যে, মহারাজ এই মামলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মোহনপ্রসাদ বলে, তুমিই ভাবিয়া দেখ আমি এখন কি করিয়া মামলা বন্ধ করিতে পারি ? আমি অনেক পদস্থ ইংরাজ ভদ্রলোককে এই বিষয় বলিয়াছি।"—ইহা হইতেই নন্দকুমারের এই কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, মোহনপ্রসাদ প্রায়ই হেষ্টিংসের বাড়ী যাইত। ফ্যারার-সাহেবও ইহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে,

মোহনপ্রসাদ নামেমাত্র বাদী, প্রকৃত বাদী হেষ্টিংস্। মোহনপ্রসাদ মামলা না করিয়াও পারিত, কিন্তু 'ইংরাজ ভদ্রলোকদের' জন্যই তাহা পারে নাই। রামনাথ এ-কথাও স্বীকার করে যে, মোহনপ্রসাদ তাহাকে টাকা ধার দিয়াছে।

গোপীনাথ দাস নামে নন্দকুমারের একজন সাক্ষী বলে যে, রামনাথ দাসকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মোহন-প্রসাদ তিন শত টাকা দিয়াছে। উপরন্তু মোহনপ্রসাদ যে অত্যন্ত ঘৃণিত চরিত্রের লোক তাহা অনেক সাক্ষীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

১৬

বিচার শেষ ও প্রধান বিচারপতির অভিভাষণ

ইহার পর প্রধান বিচারপতি সার্ ইলাইজা ইম্পে জুরীদের কাছে মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে প্রদত্ত প্রমাণের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সমালোচনা বা অভিভাষণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়। যদিও তিনি মুখে বলেন যে, জুরীরা যেন নিরপেক্ষ ভাবেই তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করেন, তথাপি ফরিয়াদী-পক্ষের সাক্ষীদের কথার মধ্যে যে ঘোর অসামঞ্জস্য দেখা যায়, মোহনপ্রসাদের জবানবন্দীতে এবং পরে তাহার সাক্ষ্যতে যে সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা আছে, তাহা তিনি একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু তিনি জুরীদের খুব স্পষ্ট ভাষায়ই বলেন যে, মোহনপ্রসাদ অতি সজ্জন,

তাহার পক্ষে মিথ্যা মোকদ্দমা করা অসম্ভব। তিনি জুরীদের যাহা-কিছু বলেন তাহার প্রায় সমস্তটাই প্রতিবাদী নন্দকুমারের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। মোহনপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মোহনপ্রসাদের সাক্ষ্যের উপর ফরিয়াদী-পক্ষের মোকদ্দমা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। সে অবিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে কিনা তাহার বিচার আপনারাই করিবেন। আপনারা প্রায় সকলেই তাহাকে চিনেন। সে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এবং ইহাই বা কতটা সম্ভব যে, সে ঈর্ষা বশতঃ কিংবা অন্য কোন অসদভিপ্রায়ে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চরম দণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে তাহাও আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"—কিন্তু মনোহর মিত্র এবং রামনাথ দাস তাহাদের সাক্ষ্যে মোহনপ্রসাদের ঘুষ দিয়া সাক্ষী সংগ্রহ করা, শুধু 'ইংরাজ ভদ্রলোকদের' খাতিরে মোকদ্দমা চালাইতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে যে-প্রমাণ দিয়াছিল ইম্পে তাহার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই।

ইম্পের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলেও নানা ত্রুটি ও দোষের আকর। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ফরিয়াদী-পক্ষের প্রমাণের কি কি দোষ

হইয়াছে তাহারও কিছুমাত্র উল্লেখ ইহাতে নাই এবং আসামীর দোষ সপ্রমাণ করিবার ভার ফরিয়াদী-পক্ষের উপর না ফেলিয়া একান্ত অন্যায় ভাবে আসামী মহারাজের ঘাড়েই তাঁহার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণের সকল ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র মোহনপ্রসাদকে অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই যেন ইম্পে নিতান্ত নিল জ্জের ন্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে অন্ততঃ তিন বার উদ্দীপনাময়ী ভাষায় নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য জুরীদের প্রকারান্তরে উত্তেজিত করিয়াছেন। মীর আসাদ আলি এবং তেজ রায়ের সাক্ষ্যের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া মহারাজের অনুকূলে প্রদত্ত সকল সাক্ষ্যকে সরাসরি ভাবে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ফরিয়াদী-পক্ষকে সমর্থন করিয়া বলিবার মত বিশেষ কিছুই ছিল না; মূল দলিল যে জাল তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অথচ নন্দকুমারের ফাঁসিও হওয়া চাই। তাই ইম্পে জুরীদের বলিলেন, "যদি আসামী-পক্ষের প্রমাণে আপনারা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ইহা মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে এবং সেই মিথ্যাও অত্যন্ত গুরুতর

রকমের, কারণ ইহা দ্বারা আসামী-পক্ষ ফরিয়াদী-পক্ষের ও তাহার সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার এবং ঘুষ দিয়া অন্যের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার দোষ আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।" এমন জঘন্য পক্ষপাতিত্বের কথা যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় তিনি যে বিচারকের আসনে উপবেশন করিবার কিরূপ উপযুক্ত পাত্র তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে পক্ষপাতশূন্য হইয়া মতামত প্রকাশ করিবার জন্য ফাঁকা উপদেশ দিয়া এবং তাঁহারা যে অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবহিত ভাবে মোকদ্দমার সকল কথা শুনিয়াছেন, এজন্য জুরীদের উচ্চকণ্ঠে কয়েকবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ইম্পে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন।

নন্দকুমারের পক্ষ হইতে ফ্যারার-সাহেব জুরীদের সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সমালোচনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তাহা করিতে দেওয়া হইল না। ইহার পর জুরিগণ উঠিয়া অন্য এক ঘরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে জুরি-প্রধান রবিন্সন আসিয়া বলিলেন—"আমাদের মতে মহারাজ নন্দকুমার অপরাধী।"

হেষ্টিংস্, বারওয়েল, সার্ ইলাইজা ইম্পে প্রভৃতি পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

১৭

প্রাণদণ্ডের আদেশ

জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া বিচারকের লিখিত রায় প্রকাশ করিবার নিয়ম, কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের বিচারে সেরূপ কোন রায় প্রকাশ করা হয় নাই। প্রধান বিচার-পতি মুখেই ঘোষণা করিলেন যে, মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইবে।

নন্দকুমারের জীবনরক্ষার জন্য ফ্যারার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ফাঁসির হুকুম স্থগিত রাখিবার জন্য ফ্যারার আপিল করিলেন এবং বিচার-পতিরা যাহাতে আসামীর প্রতি দয়া-পরবশ হন এই জন্য একখানি আবেদন-পত্র লইয়া তিনি জুরীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহাদের অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কারণ জুরীরা অনুরোধ করিলেই বিচারপতিরা দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রধান জুরী রবিন্সন বলিলেন যে, নন্দকুমারের জন্য তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে বটে, কিন্তু শপথ গ্রহণ

পূর্ব্বক জুরীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যে কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে তিনি কিছুতেই তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া ফ্যারার একজন বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী হইয়াও তাঁহার কাছে এই আবেদন-পত্র উপস্থিত করায় তিনি যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রবিন্সন এখানেই নিরস্ত হন নাই—ইহার পর তিনি বেলি নামে একজন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। প্রধান বিচারপতিকে বেলি এক চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, ফ্যারার-সাহেবের ব্যবহারে রবিন্সন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ফ্যারারের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যেন অভিযোগ করিতে দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ফ্যারারের কাজের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, ঐরূপ আবেদন-পত্র স্বাক্ষরিত করিতে চেষ্টা করা আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে ঘোর নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক। যাহা হোক্, এড্ওয়ার্ড এলারিংটন নামে একজন জুরী যে এই আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ইহাই তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা হইয়া রহিয়াছে।

বেলি-সাহেবটি ছিলেন হেষ্টিংসের প্রাইভেট সেক্রে-

টারী। ইনি হেষ্টিংসের বাড়ীতেই থাকিতেন, মাসে তিন শত টাকা বেতন পাইতেন। সুতরাং বেলি-সাহেবের প্রধান বিচারপতিকে ঐরূপ চিঠি লেখা ব্যাপারে হেষ্টিংস্‌ যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন ইহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। পাছে নন্দকুমার অব্যাহতি পান, পাছে তাঁহার ফাঁসি না হয়, এই জন্যই এই সব চেষ্টা। ফ্যারার মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকিলে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার জন্য এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিবেন। কিন্তু বিচারপতিরা ও তাঁহাদের বন্ধুগণ ইহা বেশই জানিতেন যে, এই মোকদ্দমার বিবরণ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইলে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ত রহিত হইবেই—তাঁহাদের কার্য্যকলাপও গোপন থাকিবে না।

* * * *

নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশে সারা বাংলাদেশ দুঃখে, ক্ষোভে, অসন্তোষে ভরিয়া উঠিল। দেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য বহু লোক নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বিচারকেরা সর্ব্ব-সাধারণের এ-প্রার্থনা নিঃসঙ্কোচে অগ্রাহ্য করিলেন।

এই সম্পর্কে বাংলার নবাব মোবারকদ্দৌলা সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের কাছে লিখেন—"এ-দেশের পুরাতন ব্যাপারের বা অপরাধের বিচার করিতেও যদি আপনারা নূতন ইংলণ্ডীয় আইন প্রয়োগ করেন তাহা হইলে অনর্থের সৃষ্টি হইবে এবং দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে। সুপ্রীম কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের যে-পদ্ধতিতে বিচার হইয়াছে তাহা অত্যন্ত কঠোর বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে জাল করিবার অপরাধ সাব্যস্ত হইলেও আমাদের দেশের আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে না এবং যতদূর জানি ইংলণ্ডেও এই অপরাধে পূর্ব্বে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না—অতি সম্প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটা কথা এই যে, মহারাজা ইংরাজদের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনেক কাজ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মীর কাশিম যখন ইংরাজদের উচ্ছেদ সাধন করিতে ও তাঁহাদের এ-দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হন তখন মহারাজ নন্দকুমার আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়া অর্থ এবং খাদ্য জোগাইয়া ইংরাজ সৈনিকদের প্রাণরক্ষা করেন। এইটি আপনাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত। তিনি যে-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন

তাঁহার মত লোক সেরূপ ঘৃণিত কাজ করিতেই পারেন না। তিনি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়াছে—আর তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত শত্রুরাই ঐ-অভিযোগের মূলে রহিয়াছে। কাজেই সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, যতদিন ইংলণ্ডেশ্বরের অভিমত না জানিতে পারা যায় ততদিন মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকুক।"

কাউন্সিল এই আবেদন-পত্র প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ইম্পের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি নবাবকে লিখিলেন যে, কাউন্সিলে এই রকম আবেদন-পত্র পাঠাইয়া তিনি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কাজেই এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, নবাবের এই অনুরোধ বা আবেদন অগ্রাহ্য করা হইল।

হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল দেখিলেন যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের প্রতি দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে; সুতরাং তাহাদের জানাইয়া দেওয়া দরকার যে, নন্দকুমারের প্রতি ন্যায়বিচারই করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেদের অনুচরবর্গের সাহায্যে ইম্পেকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগি-

লেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রাজা নবকৃষ্ণ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং হাঁটাহাঁটি করিয়া প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোকও সংগ্রহ করিলেন।

এই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক বলিতে নন্দকুমারের বিচারের জুরিগণ, হেষ্টিংস্‌ ও বারওয়েলের ইংরাজ বন্ধুগণ ও খানসামাবর্গ, লালবাজারের জুতার দোকানদার কয়েক-জন এবং কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতিও ছিলেন।

অভিনন্দনপত্রে মোটামুটি ছিল যে, 'ইংলণ্ডের আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কলিকাতার অধিবাসীদের বিচার করিবেন শুনিয়া আমাদের বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল; কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার যে-রকম সুবিচার হইয়াছে তাহাতে আমাদের সমস্ত আশঙ্কা দূর হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি সার্‌ ইলাইজা ইম্পে অপর তিনজন বিচার-পতির সহিত এই মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য যে-রকম পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।'

ইম্পের ব্যবহার যে কিরূপ হীন ও মনুষ্যত্ববর্জ্জিত

হইয়াছিল, তিনি যে কি উদ্দেশ্যে এমন ঘৃণিত জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। *

* লর্ড মেকলে মহারাজ নন্দকুমারকে ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অসংখ্য নিন্দাবাদ করিয়া এবং হেষ্টিংসের স্তুতি-গান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু এই বিচার এবং বিচারপতির সম্বন্ধে তিনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"No other such judge has dishonoured the English Ermine since Jefferies drank himself to death in the Tower.

"Of Impey's conduct it is impossible to speak too severely. * * * No rational man can doubt that he took this course in order to gratify the Governor General. * * * It is, therefore, our deliberate opinion that Impey, sitting as a judge, put a man unjustly to death in order to serve a political purpose."

১৮

নন্দকুমারের ফাঁসি

নন্দকুমারকে রক্ষা করিবার জন্য ফ্যারার সাহেব চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি করেন নাই। বিচারকগণ আপিল করিতে দিলেন না; ফাঁসির হুকুম স্থগিত রাখিবার জন্য মনুষ্যত্ব, আইন, বিবেক ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও হিতে বিপরীত হইল। উপরন্তু কোর্টে এবং কোর্টের বাহিরেও ফ্যারারের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং জুরীদের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে বা বিচারের কোনরূপ দোষ ধরিলে আইনের তীক্ষ্ণ কঠোর বাণ তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া প্রধান বিচারপতি যখন ফ্যারারকে শাসাইয়া দিলেন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে ফাঁসির আদেশ স্থগিত রাখিবার জন্য একখানা দরখাস্ত করাইয়া শেষ চেষ্টা করিলেন।

দরখাস্তে নন্দকুমার মোটামুটি এই কথা বলিলেন—

"আমার প্রতি যে-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে, নিজ দেশের আইন ও ধর্ম্মানুসারে নিরপরাধ আমার নিষ্কলঙ্ক বংশাবলীর উপরেও তাহা চিরকালের জন্য কলঙ্ক আরোপ করিবে। ইংলণ্ডেশ্বরের যে-আইন সুপ্রীম কোর্টকে এইরূপ বিচারের ক্ষমতা দিয়াছে, সেই আইনই সেই কোর্টকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও দিয়াছে।

"আমি যে-অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছি, বিচারের সময়ে ফরিয়াদী-পক্ষের নিজেদের কথায়ই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা অন্ততঃ ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছিল। নিজ ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি নির্দ্দোষ। যে-আইন ইংলণ্ডে কেবলমাত্র ইংরাজদের জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেই আইনই আজ বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে এই অপরাধ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাহার বিচার নবপ্রতিষ্ঠিত কোর্টে নূতন বিলাতী আইন অনুযায়ীই সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে আমি ইংলণ্ডেশ্বরের অনুগ্রহ লাভের সুযোগ পাই সেজন্য আপনি আমার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত

রাখিবেন আশা করি—আমি আপনার মনুষ্যত্বের ও ক্রিষ্টের প্রতি দয়ার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।"

আবেদন-পত্রের শেষ-ভাগে মোগল রাজ-সরকারে, তথা বাংলার নবাবের সময়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তাঁহার পদগৌরব, বংশ ও জাতি-মর্য্যাদা, দেশময় তাঁহার প্রতিপত্তি ও খ্যাতির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং আরও উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহার অপরাধ অপ্রমাণের কথা, ইংরাজদের তিনি যে-উপকার করিয়াছেন তাহার কথা, আর তাঁহার বার্দ্ধক্যের কথা।

বলা বাহুল্য তাঁহার এই করুণ আবেদনও সুপ্রীম কোর্টের ধর্ম্মাবতারগণ অগ্রাহ্য করিলেন।

জুন মাসের শেষে বিচার শেষ হইল। বিচারকদের ইচ্ছা ছিল জুলাই মাসের মধ্যেই নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁহারা বেশই বুঝিয়াছিলেন, নন্দকুমারের ফাঁসিতে বাঙ্গালীরা এরূপ ভীত ও বিপর্য্যস্ত হইবে যে, গভর্ণর জেনারেল ত দূরের কথা, কোম্পানীর কর্ম্মচারী-মাত্রের বিরুদ্ধেও আর কেহ মাথা উঁচু করিতে সাহস করিবে না,—কাজেই এই আতঙ্ক, এই ভয় দেশীয় লোকের মনে যত শীঘ্র জন্মাইয়া দেওয়া যায় ততই তাঁহাদের সুবিধা। কিন্তু ফাঁসির দিন স্থির হইল ৫ই আগষ্ট।

জুলাই মাসে ফাঁসি না দেওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল। কারণটি এই—কাউন্সিলে ফ্রান্সিস্, মন্‌সন্ ও ক্লেভারিং হেষ্টিংসের অন্যায় কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার একটা দুর্দ্দমনীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিল; কিন্তু তাঁহাদের অপদস্থ ও দমন করিবার মত কোন সুযোগ তিনি এতদিন পান নাই। এখন তিনি ভাবিলেন, যদি নন্দকুমারকে দিয়া স্বীকার করানো যায় যে, তিনি কাউন্সিলের ঐ তিনজন সভ্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে ঐরূপ সুযোগ মিলিতে পারে। কিন্তু ফাঁসির হুকুমের পরেও নন্দকুমারের অটল-অচল ভাব দেখিয়া হেষ্টিংসের সহচরদল বুঝিলেন যে, তাঁহাদের এ-আশা সফল হইবার নয়। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়াও নন্দকুমার নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ, উদারপ্রাণ ফ্রান্সিস্, ক্লেভারিং ও মন্‌সনের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিতের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সমবেদনার কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না।

হেষ্টিংস্, বারওয়েল, সুপ্রীম কোর্টের ধর্ম্মাবতারগণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ যখন নিশ্চিন্ত আনন্দে আত্মহারা

হইয়া দিন কাটাইতেছিলেন, তখন দেশের লোক দলে দলে জেলখানায় গিয়া মহারাজ নন্দকুমারের সহিত দেখা করিতে ও তাহাদের অন্তরের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জুলাই মাস শেষ হইয়া গেল। ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে জেলের অধ্যক্ষ (Superintendent) ম্যাক্রেবী-সাহেব মহারাজ নন্দকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। নন্দকুমার অটল, অচল, নির্ভীক, প্রফুল্ল। তাঁহার সেই সদাপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া সাহেব বিস্মিত হইলেন, নির্ব্বাক্ শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় নন্দকুমার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ জানিতে পারেন নাই। কারাগারের অসংখ্য অসহনীয় মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে অভ্যস্ত ম্যাক্রেবী-সাহেব এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেন নাই। পরদিন প্রত্যুষে যাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে তিনি যে কি করিয়া হাসিমুখে নির্ভীক নিষ্কম্প ভাবে বসিয়া কথা কহিতে পারেন তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি অতি করুণ ভাবে নন্দকুমারের পাশে আসিয়া বসিলেন এবং ভারাক্রান্ত চিত্তে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজ, কালই ত আপনাকে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে ; আপনি আজ আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ

করুন। আপনার যদি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, কিম্বা যদি অন্য কিছু দরকার থাকে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

নন্দকুমার বলিলেন, "আপনার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই,—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে। ফ্রান্সিস্, মন্সন্ ও ক্লেভারিং সাহেবকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবেন।"

ম্যাক্রেবী-সাহেব চলিয়া গেলেন। তাহার পূর্বে নন্দকুমারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বহু লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকরুণ দৃষ্টি, দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই, পরন্তু তিনিই তাঁহাদের সান্ত্বনা দিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই তিনি জীবনের শেষ-সময়ে অগতির গতি বিশ্ববিধাতার চরণতলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় নন্দকুমার সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করিয়া রাজা গুরুদাসকে কিরূপে বিষয়-কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অনেক কথা লিখিয়া রাখিলেন এবং বহু হিসাব-পত্র দেখিলেন। তার পর ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে শুইয়া পড়িয়া গাঢ়

নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ভোর হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ভোর হইতেই ম্যাক্রেবী-সাহেব আসিয়া দেখা দিলেন। নন্দকুমার তখন প্রস্তুত হইয়াছেন। খিদিরপুরের পুলের পূর্ব্ব দিকে যে-স্থানটি কুলীর বাজার বলিয়া পরিচিত, সেই স্থানটিই তাঁহার ফাঁসির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তাঁহার শবদেহ বহন করিবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। তাঁহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী আসিল। তিনি পাল্কীতে চড়িয়া চলিলেন, ম্যাক্রেবী-সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাস্তার দুইধারেই মানুষের সুদীর্ঘ প্রাচীর। নন্দকুমার পাল্কীর রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিতে বলিলেন। জনসঙ্ঘ 'হায়! হায়!' করিয়া উঠিল।

নন্দকুমারের ফাঁসি দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হইল; সমস্ত কলিকাতার লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের বুক-ফাটা করুণ আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরিয়া দিল।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় নন্দকুমারের পাল্কী সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। বিপুল জনতার মধ্য হইতে একটা বিপুল ব্যথিত কোলাহল উত্থিত হইল। অনেকে চীৎকার

করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নন্দকুমার স্বাভাবিক প্রশান্ত চক্ষে একবার সকলের দিকে চাহিলেন, তার পর নিজের কপালে হাত দিয়া নির্ব্বাক্ ভাষায় বলিলেন—অদৃষ্ট! তাঁহার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের সহিত চিরবিচ্ছেদের সময়েও নন্দকুমারের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল না। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল, গম্ভীরোজ্জ্বল মুখের উপরে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও একটু দুঃখের, মলিনতার ছায়াপাত হইল না।

পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণগণ কাছে আসিল এবং নন্দ-কুমারের ইচ্ছানুসারেই তাঁহার হাত বাঁধিয়া দিল। এই সময় জীবনে শেষবারের মত চক্ষু মুদিয়া তিনি এক-বার ভগবানকে ডাকিলেন; অসংখ্য জনগণের বিষাদ-মলিন চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সকরুণ দৃশ্যে

"বর্ম্ম আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছল ছল।"

ম্যাক্রেবী-সাহেবও অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারও সর্ব্বশরীর অসার নিস্পন্দ হইয়াছিল।

নন্দকুমার নিজেই ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সমবেত সহস্র সহস্র লোক দুরু-দুরু বুকে ভয়বিহ্বল চোখে চাহিয়া রহিল। তক্তা টানিয়া নেওয়ার জন্য তিনি নিজেই

ঘাতককে ইশারা করিলেন। নিমেষমধ্যে বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, দরিদ্র, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িতের বন্ধু, কোটি কোটি বাঙ্গালীর ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণহীন দেহ ঝুলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান জনগণ যেন শত-সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

"ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল," "কলিকাতা অপবিত্র হইল," "বাংলা-দেশ পাপে ডুবিল"—ইত্যাদি রূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিশাল জনসঙ্ঘ সেখান হইতে ছুটিয়া চলিল। ব্রহ্মহত্যা দেখাও মহাপাপ মনে করিয়া তাহারা অনেকেই গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে-দিন কলিকাতা নগরে বাঙ্গালীরা অন্নগ্রহণ করিল না; এ-রকম পাপ-কলুষিত স্থানে অন্ন-গ্রহণ করাও ভীষণ পাপ মনে করিয়া, গঙ্গা পার হইয়া অন্যস্থানে গিয়া অনেকে আহারাদি করিল, অনেকে কলিকাতা—কোম্পানী-শাসিত কলিকাতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অন্যত্র চলিয়া গেল।

এই দুঃসংবাদ ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল।—

"যে শুনে আঁখি মুদি' রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।"

১৯

শেষ

নন্দকুমারের ফাঁসির অব্যবহিত পরেই, নিজেদের দোষস্খালন করিবার জন্য, সার্ ইলাইজা ইম্পে ও হেষ্টিংস্ ইলিয়ট-সাহেবকে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। ইলিয়ট খুব চতুর ও জোগাড়ে লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় সেখানে ইম্পে ও হেষ্টিংস্ অনেকের দ্বারাই সমর্থিত হইতে পারিবেন এইরূপ আশাই তাঁহারা করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার যখন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণ ও অন্যান্য কুক্রিয়ার অভিযোগ উপস্থিত করেন তখন কলঙ্কের ভয়ে হেষ্টিংস্ পদত্যাগ-পত্র দেন। এখন নন্দকুমার অপসারিত হইয়াছেন, সমস্ত বাংলাদেশে এমন আর কেহ নাই যে, হেষ্টিংস্ কিংবা তাঁহার কোন সহচরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা বলে, সুতরাং তিনি পদত্যাগ করা আর দরকার বিবেচনা করিলেন না। পদত্যাগ-পত্র লইয়া তিনি বিশেষ গোলমাল আরম্ভ করিলেন। তাঁহারই

সেক্রেটারী তাঁহারই কথায় এই পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে নূতন গভর্ণর জেনারেলও নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি নিজে পদত্যাগ-পত্র দেন নাই বলিয়া পদ-ত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনিই গভর্ণর জেনারেল রহিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচার, অনাচার ও উৎকোচ-গ্রহণের কথা চাপা থাকিল না, ইংলণ্ডেও তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

এদিকে নন্দকুমারের ফাঁসির দিন পনেরো পরে ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার আরম্ভ হইল। নন্দকুমার জীবিত নাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু আলোচনাই হইল না। রাধাচরণ রায়ের উপরে সুপ্রীম কোর্টের এলাকা আছে কিনা বিচারপতিগণ সে-সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। বাকী রহিলেন শুধু প্রধান আসামী জোসেফ্ ফাউক্। এই ফাউকই শেষে অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারপতিরা তাঁহার মাত্র পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। একে গভর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, তাহার উপর বিচারপতিরা সকলেই তাঁহার হাতের পুতুল, এ-অবস্থায়ও প্রধান আসামীরই যখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল, তখন নন্দকুমার যে কিরূপ অপরাধী ছিলেন

তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কিছুই হইবে না বুঝিতে পারিয়াই হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দলিল জালের মোকদ্দমা সৃষ্টি করিলেন এবং ইম্পের সহায়তায় নন্দকুমারকে বিনষ্ট করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার যে-সকল গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহার কোন তদন্ত হইল না, বিচার হইল না, তাহা তখনকার মত অপ্রকাশিতই রহিয়া গেল।

*   *   *   *

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গেলেন। তখন তিনি একজন ধন-কুবের। প্রথমেই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, সম্মান ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি বহুমূল্য মণি-রত্ন উপহার দিলেন। রাজা তথা রাজমন্ত্রীদের খুসী করিয়া ভাবিলেন, এবার সস্ত্রীক নিরাপদে ও সুখ-শান্তিতে দিনপাত করিবেন। কিন্তু মাত্র সাতদিন কাটিতে না কাটিতেই জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিক, মহাপ্রাণ এড্‌মণ্ড্ বার্ক পার্লামেণ্ট মহাসভাকে জানাইলেন যে, ভারতবাসীর উপর অশেষবিধ উৎপীড়নের অভিযোগে হেষ্টিংস্‌কে অভিযুক্ত করিবার জন্য তিনি এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

কলিকাতা কাউন্সিলের সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্ তখন ঐ-মহাসভার একজন সভ্য। হেষ্টিংসের কুক্রিয়া ও অনাচারের কথা ইংলণ্ডবাসীর নিকট প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনিও মহামতি বার্ককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ফক্স, শেরিডান্ প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিক ও বক্তাও বার্কের সহিত যোগ দিলেন। পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় (House of Commons) বার্কের প্রস্তাব গৃহীত হইল, সুতরাং হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করাই স্থির হইল।

যথাসময়ে কমন্স-সভা কর্ত্তৃক হেষ্টিংস্ পার্লামেণ্টের লর্ডস্-সভার নিকট অভিযুক্ত হইলেন। পার্লামেণ্টের ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার গৃহ (Westminister Hall) নামক বিখ্যাত গৃহে হেষ্টিংসের বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি কুড়িটি অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। ইহার মধ্যে রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎ সিংহের সম্পত্তি লুণ্ঠন, অযোধ্যার বেগমদের অর্থ লুণ্ঠন, উৎকোচ-গ্রহণ এবং নন্দকুমারের ফাঁসি ইত্যাদিও ছিল।

ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষের বিচার—তাঁহার বিরুদ্ধে অতি গুরুতর, অতি ভীষণ অভিযোগ। চারি-দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচার

কাহিনী শুনিবার ও তাঁহার বিচার দেখিবার জন্য ইংলণ্ডের চারিদিক্ হইতে পদস্থ গণ্যমান্য লোক এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা অনেকেই উপস্থিত হইলেন। বহু সাধারণ লোকও সমবেত হইল। সকলেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং উৎসুক নেত্রে মহামনা বার্ক ও তাঁহার সহচরদের লক্ষ্য করিতে লাগিল। পরিশেষে বৃটিশ ভারতের ভূতপূর্ব্ব হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ও বর্ত্তমান বিচারের আসামী ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া, মাথা নত করিয়া বিচারকদের সম্মান দেখাইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। এমন ব্যাপার—এমন বিচার আর কোথাও কখনও হয় নাই।

অপূর্ব্ব তেজস্বিতা লইয়া কমন্স-সভার পক্ষ হইতে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বার্ক হেষ্টিংসের অভিযোক্তারূপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকারণ্য নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইল। জলদ-গম্ভীরস্বরে, আবেগময়ী, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বার্ক হেংষ্টিস্ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্ব্বিষহ স্বৈরাচারের কাহিনী তাঁহার অসাধারণ বাক্-চাতুর্য্যের সহিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-কৌশলে চিত্রের পর চিত্র যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনসাধারণ উদ্ভ্রান্ত মুগ্ধ হইল—শত্রুগণ বিচলিত অবসন্ন হইল। এই প্রাণময়ী

ওজস্বিনী ভাষায় ভারতবাসীর নির্য্যাতন কাহিনীর বর্ণনা মহিলাদের অন্তরে এমন আঘাত করিল যে, তাঁহারা অনেকেই অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। বিখ্যাত বাগ্মী শেরিডানের পত্নী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায়ই বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইল।

এই বিখ্যাত বিচার ক্রমাগত দুই বৎসর চলিবার পর পার্লামেণ্টের নূতন নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। পুরাতন সভ্যদের স্থানে অনেক নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ভারতবন্ধু বার্ক প্রভৃতির পক্ষে এই নির্ব্বাচনের ফল বিশেষ অনুকূল হইল না।

এই বিচার সম্পর্কে পদপিষ্ট, নির্য্যাতিত, অবহেলিত ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বার্ক যে অসাধারণ চরিত্র-বলের পরিচয় দিলেন তাহার স্বরূপ একটি ঘটনা হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বিচার আরম্ভ হইবার একবৎসর পরে বার্কের প্রতি দোষারোপ করিয়া পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দোষারোপের কারণ এই যে, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি এবং হেষ্টিংস্ ও ইম্পের বন্ধুত্ব সম্পর্কে বার্ক অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হন নাই। যে মহান কর্ত্তব্যে

তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহার দেশবাসীর অজস্র নিন্দাবাদও সে-কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ন্যায়ের ও মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, হতভাগ্য উৎপীড়িত ভারতবাসীর করুণ কাহিনী সকলের সমক্ষে প্রচার করিবার জন্য, অপরাধীকে হেয় এবং দণ্ডিত করিবার জন্য তিনি যে নৈতিক সাহস ও নৈতিক চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপরিসীম মহত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

এদিকে হেষ্টিংস্ ও তাঁহার বন্ধুগণও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। হেষ্টিংস্ কখনও ভাবেন নাই যে, বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া এমন বিপদে পড়িবেন। তাঁহার কলঙ্ক ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেই, তাহার উপর যদি আইনের চক্ষেও অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হন তাহা হইলে হয় ত ক্লাইবের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকিবে না। ভারতবর্ষ হইতে যে অপরিমিত অর্থ তিনি সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছেন এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য তাহার সমস্তই তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর এবং মন্ত্রীসভা তাঁহাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। অর্থবলে অনেক কিছুই সম্ভব হইল। তখনকার অধিকাংশ সাময়িকপত্র-সম্পাদককে, অনেক লেখক এবং প্রতিপত্তি-

শালী লোককে প্রচুর অর্থ দিয়া হেষ্টিস্ হস্তগত করিলেন। তাঁহার সপক্ষে অনেক কাগজেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার ভারতের কার্য্য এবং নীতি সমর্থন করিয়া বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হইল, বড় বড় পুস্তকও রচিত হইল। জনমত হেষ্টিংসের অনুকূলে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতে লাগিল। এইরূপে পাপের ধন অনেকটা প্রায়শ্চিত্তেই গেল।

অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতের নরনারীর নামে, যে-পার্লা-মেণ্টের ন্যস্ত বিশ্বাস তিনি ভঙ্গ করিয়াছিলেন সেই পার্লামেণ্টের নামে, ইংরাজ জাতীর নামে এবং দুনিয়ার বিচারক ভগবানের নামে বার্ক হেষ্টিংসের দারুণ অপরাধের বিচার প্রার্থনা করিলেন। *

* "I impeach Warren Hastings, Esq, of., high crimes and misdemeanours. I impeach him in the name of the Commons of Great Britain in Parliament assembled, whose Parliamentary trust he has betrayed. I impeach him in the name of all the Commons of Great Britain, whose national character he has dishonoured. I impeach him in the name of the people in India, whose laws, rights, and liberties he has subverted, whose properties he has destroyed, whose country he has

সাত বৎসর ধরিয়া বিচার চলিল। বার্ক ও তাঁহার সহচরগণের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও চির-অনুদারপন্থী লর্ডস্‌-সভার সভ্যগণের বিচারে হেষ্টিংস্‌ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কমন্স-সভা হেষ্টিংস্‌ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্ধারণ প্রত্যাহার করিলেন না।

হেষ্টিংসের বিচার-কাহিনী ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হইয়া রহিয়াছে। বার্কের বক্তৃতাবলী ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে বিরাজ করিতেছে।

বিচারক-কুল-কলঙ্ক ইম্পেকেও তাঁহার অবিচার ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের জন্য অভিযুক্ত করিবার প্রস্তাব পার্লা-মেণ্টের কমন্স-সভায় উত্থাপন করা হইল। কিন্তু হেৎষ্টিস্‌ ও ইম্পের বন্ধুবর্গ এবং মন্ত্রীসভার প্রতিকূল চেষ্টায় তাহাও ব্যর্থ হইল।

---

laid waste and desolate. I impeach him in the name and by virtue of those eternal laws of justice which he has violated. In the name of human nature itself which he has cruelly out-raged, injured, and oppressed in both sexes, in every age, rank, situation and condition of life. I impeach the common enemy and oppressor of all."